মুক্তি এমন একটি সমাজে যেখানে তার নারীশক্তি, তার আনন্দশক্তি আপন উচ্চতম প্রশস্ততম অধিকার সর্বত্র লাভ করতে পারে। [ভা. বিবাহ]

- 'যে মেয়েদের মধ্যে সত্য আছে, সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো।' [প. যা. ডায়ারি]

দুই ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র মনোভাব স্পষ্ট। নারী বন্ধন অস্বীকার করবে না, এ সিদ্ধান্ত খুবই স্পষ্ট। শুধু বৃহত্তর সমাজ ভেবে নারীর আনন্দ ও প্রেম মেলে ধরার আদর্শ পরিস্থিতি কবে কীভাবে গড়ে উঠবে তার কথা বলা নেই। কিন্তু এই সূত্র-নির্দেশের প্রয়োগ কুমুর জীবনে অতীব স্পষ্ট। বন্ধন ছিন্নতার জিদ নিয়ে স্বতন্ত্র হতে চাওয়া কুমুকে অনৌচিত্যের কারণেই পুনরায় বন্ধন স্বীকারে বাধ্য করেছেন শিল্পী।

সংসারে পুরুষ কর্তৃক নারীধর্ম নির্জিত হওয়ার ঘটনাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র ১৯২৪ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বরের পত্রে তিনি লিখছেন—

- পুরুষ কখনো কখনো এমন কাজ করে যেন নারীর মধ্যে অনির্বচনীয়তার কোনো আভাস নেই, যেন তার মাটির প্রদীপে কোনো আলো জ্বলেনি; তখন লুব্ধ দাঁত দিয়ে তাকে সে আখের মতো চিবিয়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়।

এ ধরনের হানিকর মন্তব্য ভুলেও মধুসূদন সম্বন্ধে উচ্চারণ করা যাবে না। মধুসূদন লম্পট নয়, যৌন নিপীড়কও নয়। রক্তকরবীর রাজার মনে একবার এ ইচ্ছা জেগেছিল, নন্দিনীকে পেলে ডালিমের দানার মতো সে দশ আঙুলে রস বার করে নিতে পারে। মধুসূদনে-এর স্বল্প ছায়াটুকুও নেই।

নারীর সংস্কারবন্ধন তৈরি করার সোজা সাপ্টা পথ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুই উৎসেই একই প্রকার মন্তব্য করেছেন। ভারতীয় বিবাহের একটা বড়ো ভিত্তি হলো সুসন্তান লাভ। ভারতবর্ষীয় বিবাহ প্রবন্ধে 'কুমারসম্ভব' ব্যাখ্যা সূত্রে তার সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তেও তাঁর মন্তব্য—

- মেয়েরা যখনই মাতৃত্বের অধিকার পেয়েছে তখনই এমন সকল হৃদয়বৃত্তি পেয়েছে যাতে করে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন তাদের পক্ষে সহজ হতে পারে।

এ তত্ত্ব নারী-পুরুষ দু-জনেই দু-ভাবে মান্য করেছে। কুমুদিনীর মনের নাগাল পেতে নাজেহাল মধুসূদন ভেবেছে সন্তানের যোগবন্ধনেই কেবলমাত্র কুমুকে বশ করা যাবে। আর, সন্তান গর্ভে আসার পর ঐ অবধারিত সত্যের কাছে কুমুর সমস্ত প্রতিরোধ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অন্যেরা যখন একবাক্যে এ নিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছে তার উপর, কুমু একটুও প্রতিবাদ করেনি। কুমু এই সড়ক ধরেই ফিরেছে স্বামী গৃহে, কোন শর্তবন্ধন ছাড়াই। আর এই সম্বন্ধ সত্যের জোর তীব্র ছিল বলেই হয়তো তার স্বামীর সংসারে একটানা বত্রিশ বছর টিকে যাওয়া।

দাম্পত্য দ্বন্দ্ব :

কত বিচিত্র কারণে যে দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়, 'যোগাযোগ' উপন্যাসটিকে তারই একটি 'থিসিস' বা দলিল বলা যায়। এ বিষয়ে এতো সূক্ষ্ম আর গভীর অনুসন্ধান রবীন্দ্রনাথের আর কোন উপন্যাসে নেই। বর্তমান উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বের তাপ-উত্তাপে থাকতে থাকতে আমাদের

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন টান ধরে। অনেকটা ভূগর্ভ খুঁড়তে খুঁড়তে গভীর অতলে নেমে গেলে অক্সিজেনে টান ধরার মতো। রবীন্দ্রনাথ সমস্যাটাকে একবারই ধরলেন এবং তলাতে তলাতে এমন সীমা পর্যন্ত চলে গেলেন যেখান থেকে স্বভাবদমে ফেরা মুস্কিল। বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব, কালচার, ব্যক্তিরুচি, অপ্রত্যাশিত ঘটনা এসব এমনই হুড়মুড় করে সমস্যাবিচার স্তরে চলে এসেছে যে গোলকধাঁধা থেকে বেরোনো সত্যই কঠিন। এ যেন চক্রব্যূহে অভিমন্যুর তীরবেগে ঢুকে পড়া এবং ফেরার পথ না জানার কারণে বিপর্যস্ত হবার মতোই এক ব্যাপার। কাজেই কুমু-মধুসূদনের সমস্যার গভীর শেকড় কোথায় তা এক সতর্ক অনুসন্ধানেরই বিষয়।

প্রথমে দেখা যাক্, এদের বিবাহবন্ধনে পারস্পরিক মনোভাবটা কী রকমের ছিল। কুমুর বিবাহ প্রথামত সামাজিক বিবাহ। দেখা শোনা, দর কষাকষি ইত্যাদি। এতে অভিভাবকরাই নিয়ন্তার ভূমিকায় থাকেন, পাত্রীর সচরাচর কোন মতামত থাকে না। এখানে কিন্তু 'কন্যা আপনি স্বয়ম্বরা'। কুমু একটা impulse-এর (অকারণ) ঝোঁকে জিদ্ করে নিজে এই বিবাহ ঘটিয়েছে। পাত্রের ধনপ্রাচুর্য, বয়সের ব্যবধান নিয়ে বিপ্রদাস ভাবতে চাইলেও কুমুই বাধা দিয়েছে। নীলমণি ঘটকের কথার খানিক অংশ দরজার আড়াল থেকে শোনামাত্রই কুমুর বাঁ চোখ নেচে উঠলো। কিন্তু আচার্যির কোষ্ঠী বিচারে যেহেতু তার রাজরাণী হওয়ার আগাম ঘোষণা ছিলো, ভাবপ্রবণ কুমু তাই একে তার জীবনে দৈবনির্দেশিকা বলে মনে করলো। দাদার সম্বন্ধ স্থাপনার অনিচ্ছার বিরুদ্ধে তার প্রতিক্রিয়া ছিল এই রকম—**ক.** দৈবের দানকে দাদা এমনভাবে সন্দেহ করছেন কেন, **খ.** দাদার কাছে তার সাফ জবাব—'আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না'। সুতরাং কুমুর বিবাহ ছিল তার দিকে থেকে **১.** যাচিত বিবাহ এবং **২.** এক অধ্যাত্মিকভাবালুতার কাছে আত্মসমর্পণ করার ঘটনা। বলা বাহুল্য, কার্য ফেরে তার এই বিবাহ মানসিক ইচ্ছার অনুরূপ হয়নি। বরং হয়েছে উল্‌টো ধরনের। মধুসূদন বংশানুক্রমিক বিরোধের শোধ তোলার জন্য চাটুজ্জে ঘরের মেয়েকে হেনস্থা বা শায়েস্তা করার জন্যই ঘটক পাঠিয়ে এই বিবাহের ব্যবস্থা করেছিল। এক্ষেত্রে কেবলই পরিকল্পিত প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার থাকলে একরকম ঘটতো। কিন্তু বয়স্ক মধুসূদনের চোখে কুমুর অনির্বচনীয় শ্রী ধরা দিল। তখন খুশিমত নিপীড়নের প্রশ্ন তো রইলোই না, বিপরীতে অলভ্যাকে লাভ করার নানান্ প্রতিক্রিয়া তাকে নিয়ত অস্থির করে তুললো। এ থেকে একথাই মনে হয়, কুমু-মধুসূদনের বিবাহে প্রথম থেকেই কোন ঐক্যবন্ধনের বাতাবরণ ছিল না। ইচ্ছার বিপরীতগামিতাই এদের চলনধর্ম।

আর এক বাহ্যিক কারণ এ বিবাহের দ্বান্দ্বিক ভিত্তিমূল রচনা করে দিয়েছে। অসম বয়সের ফারাকে সেকালে আক্‌চার বিবাহ হতো। ত্রিশ-উর্ধ্বের পাত্রের সঙ্গে উনিশ বছরের পাত্রীর বিবাহ কোন সমস্যাই উৎপাদন করতো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বিষয়টাকে অন্যদিক থেকে বিবেচনা করেছেন। পাত্রেরই বয়সাধিক্যের কারণে নবীন কিশোরী পাত্রীর সঙ্গে পাত্রের বয়সের ব্যবধান ৪০, ৫০ বা ৬০ বছর হলেও কোন ক্ষতি থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে পাত্রীর বয়স উনিশ। অর্থাৎ পরিণত মনের গঠন অনুযায়ী ইচ্ছাশক্তির গতিবেগ এক্ষেত্রে প্রবল, রুচিগত সংঘাত ঘটাও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সামাজিক গতিধারায় এই দ্বন্দ্ব processed হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই কুমুর উনিশ বছরের বিড়ম্বনাকর বয়সটাকে ঘিরে দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব রহস্যজনকভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তি দায়ের প্রসঙ্গে আসার আগে এই দ্বন্দ্বের আরও কিছু বাহ্য উপাদানের

প্রসঙ্গ আনা যেতে পার।

যত গৌণই হোক্ না কেন, স্বামী-স্ত্রীর চেহারা ও মানসিক গঠনে বৈপরীত্য থাকলেও সমঝোতায় অসুবিধে হয়। মধুসূদন লোমশ, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ, স্বভাবের দিক থেকে রুক্ষ ও উগ্রপ্রকৃতির। অন্যদিকে কুমুর সৌন্দর্যে শান্ত পবিত্রশ্রী বর্তমান, স্বভাবে সে স্বল্পবাক এবং কলহবিরোধ তার রুচির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।

একটা প্রজন্মবাহী বিরোধের জের টানছে মধুসূদন। শেয়াকুলি গ্রামের কর্তৃত্ব হারিয়ে আনন্দ ঘোষাল যেদিন নুরনগরের ভিটে ছেড়ে রজবপুরে উঠে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই অপমানের শেল ক্রোধের আগুন হয়ে জ্বলছিল বালক মধুসূদনের মনে। এরপর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির স্তরে ধাপে ধাপে উঠে এসেছে মধুসূদন ঘোষাল, রাজাবাহাদুর খেতাবও পেয়েছে। মধুসূদনের মনে বিরোধের আগুন কিন্তু ধিকিধিকি জ্বলছিলই। ঘোষাল ও চাটুজ্জে বংশের দুই বর্তমান প্রতিনিধি মধুসূদন-বিপ্রদাসের মধ্যকার লড়াইয়ের একটা বাতাবরণ এই দাম্পত্য কাহিনীকে ঘিরে রেখেছে। লক্ষণীয়, মধুসূদন মুকুন্দ চাটুজ্জের মেয়েকে সরাসরি তার বিরোধ-প্রতিহিংসার target করে নি কখনোও। কিন্তু বিপ্রদাসকে সে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। এই বিপ্রদাস আবার ছায়া অস্তিত্বের মতো জড়িয়ে রয়েছে কুমুর জীবনে। এটাই অসহ্য ঠেকেছে মধুসূদনের কাছে। নুরনগরী চাল ভাঙার জন্য তার অনেক বাড়াবাড়ি প্রয়াসের মধ্যে এই ভূত দেখার ব্যাপারটা থেকে গেছে। কুমু যদি সত্যই তার স্বাতন্ত্রটুকু কেবলমাত্র বহন করতো তবে কোন অসুবিধাই ছিল না। কিন্তু কুমুর সঙ্গে সহবাস করতে হলে ছায়া-বিপ্রদাসের ভারবহনকে যোদ্ধা মধুসূদন আর অনিবার্য পরাভব বলেই মনে করছে। এজন্যই তার ভূত তাড়ানোর অস্থির ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে এরকম ধারণা করাটা অন্যায় হবে না যে, এগল্পে বিপ্রদাসের মৃত্যু ঘটলে কুমুর সমঝোতার কাজ অনেক সহজ হতো। তার দিকে থেকে সজীব উত্তরাধিকার বহনের গরজটা কমতো, আর মধুসূদন যত্র-তত্র ভূত দেখে আঁতকে উঠতো না।

এরপরই আসে দাম্পত্য সম্পর্কের যারা শরিক তাদের পারস্পরিক দায়বোধের কথা। প্রথমে মধুসূদনের কথাই বলি। উন্নতি করায় অনন্যমনা মধুসূদন কোনদিনই নারীকে যৌবনের লক্ষ বস্তু করে তোলেনি। মধ্যযৌবনে প্রতিপত্তি স্থাপনের কাজটা চুকিয়ে জীবনে নারী সঙ্গ স্থাপনার দিকে সে মন দিল। নারী-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আনাড়ি মধুসূদনের সংসার যাত্রায় তাই নানা হোঁচট খাওয়ার চিহ্ন। মনে-প্রাণে অঙ্ককষা মানুষ মধুসূদন জানে, বিলম্বে সংসার ক্ষেত্রে তার অনুপ্রবেশ। সুতরাং এখানকার পালা তাকে চটপট চুকিয়ে ফেলতে হবে। এজন্যই তার ধাতুপ্রকৃতিতে অস্থিরতার জন্ম। সঙ্গে আর এক অর্জিত অভ্যাস তার রয়ে গেছে। তরতরিয়ে প্রতিষ্ঠার স্তরে উঠে আসা মধুসূদনের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক প্রভুত্বের ভাব। কুমুদিনী আসার আগে ঘোষাল বাড়ির অন্তঃপুরের জীবনধারায় তার প্রভুত্বের ফাঁক দিয়ে একটুও বাতাস বইতে দেয়নি সে। কুমুর সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপনার রুটিনে এই মনোভাবেরই ছায়া পড়তে দেখেছি আমরা। কুমুকে ভয় করা বা বশে আনার জন্য মধুসূদনের উপর্যুপরি পরিকল্পনাগুলো যেমন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে তা থেকে তার অধীর মানসিকতার উত্তেজনাকেও আমরা টের পাই।

প্রথম যৌবনের আবেশ পেরিয়ে এসে নারীসঙ্গ করতে গিয়ে মধুসূদনের সবচেয়ে বড়ো সংকটটা হলো এই, সে চকিতে নববধূর মধ্যে একটা অসাধারণত্বের ভাব আবিষ্কার করে বসলো। তার ব্যবসাদারী মনের মধ্যে চোরা মুগ্ধতার এই অনুপ্রবেশ এক বিচিত্র ব্যাপার। এই

বাইশ

অসাধারণ রমণীকে সাধারণ পৌরুষবিধি দিয়ে বশ করা যাবে না একথা সে বেশ বোঝে। আবার ঠিক ঠিক বোঝেও না, অপ্রাপণীয়াকে জয় করতে হলে কী ধরণের treatment করতে হয়। স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে নম্র ও নত হয়ে, অজস্রবার gift বা ঘুষ দিয়েও মধুসূদন কুমুর মনের তল পায়নি। অন্যদিক থেকে অস্থিরতাবোধ তাকে উত্যক্ত করে ফেলায় নম্রতার মুহূর্তগুলিতেই সে হঠকারীর মতো রুক্ষতা প্রকাশ করে ফেলেছে। কুমুকে সইয়ে সইয়ে মানানোর মতো বুদ্ধি ও ধৈর্য কোনটাই মধুসূদনের মধ্যে ছিল না।

নারীর দিক থেকে প্রথম যৌবনে মুখ ফেরানো পুরুষদের মধ্যে যৌনতার বেগ উত্তরকালে সচরাচর প্রবল হওয়াটাও নিয়ম। তদুপরি মধুসূদন তার নিজের গঠন ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আস্থাবান ছিল না। রুক্ষ ও পাকানো চেহারার মানুষের মধ্যেও যৌনতা প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মধুসূদন প্রতিরুদ্ধ তৃষ্ণার শিকার হয়েছে তার দাম্পত্যে। মধুসূদনের যৌনক্ষুধা কুমুর অস্বাভাবিক যৌন-শীতলতার দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হয়েছে। যেখানে মানসিক বন্ধনে আটকায় সেখানে যৌন সম্পর্ক একটা প্রতিবিধানী ব্যবস্থা হতেই পারে। এক্ষেত্রে যৌন সহযোগে পারস্পরিক আগ্রহের বৈপরীত্য এক মস্ত বাধা। মধুসূদন একাধিকবার কুমুর কাছে সহজ মিলন প্রত্যাশায় অগ্রসর হয়ে কুমুর ভয়ার্ত রক্তশূন্য অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে। এমনই এক প্রতিরুদ্ধ যৌনতার মুহূর্তে আহত মধুসূদন তার শয্যা থেকে কুমুকে নামিয়ে দেওয়ার চূড়ান্ত ভুল পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছিল। ভীত শঙ্কাতুরা রমণীকে অনভিজ্ঞ প্রদেশে হাত ধরে সহানুভূতির সঙ্গে আহ্বান করাটা অর্থহীন জেনেই মধুসূদন শেষ পর্যন্ত শ্যামাসুন্দরীর সান্নিধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখানেও জৈব আবেগের সঙ্গে অস্বাভাবিক শীতলতার ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে অনেকদিন ধরে।

কুমু-মধুসূদনের দাম্পত্য অবন্ধনের কথা খতিয়ে দেখতে গিয়ে একটা সাদাসাপটা বিচার আমরা ঝটিতি করে বসি। রুক্ষ, কর্কশ মধুসূদনের কাঁধে সর্ব দায় ফেলে আমরা সহজে পার পেতে চাই। কিন্তু অনুপুঙ্খ দর্শনে প্রমাণ হয়, মধুসূদন তার স্বভাব এবং রুটিনবদ্ধ অভ্যাস অনেকটাই বদলাতে চেয়েছিল অপ্রাপণীয়া কুমুর জন্যে। রূঢ়তা যেমন তার আচরণকে উৎকট করেছে, তেমনি মাফ চেয়ে স্ত্রীর পদপ্রান্তে বসা এবং আকস্মিক রূঢ়তার পরে নম্রআবেগ নিয়ে স্ত্রীর কাছে দাঁড়ানোর পিছনে তার কোন অভিসন্ধিপরায়ণতা ছিল না। সান্নিধ্য-কাঙাল এই মানুষটি তার খাওয়া-শোওয়া, অফিস যাওয়া ইত্যাদি রুটিনওয়ার্ক গুলোকেও পরিবর্তিত করে ফেলেছিল একটা অমোঘ প্রত্যাশার টানে, যার নাম কুমুর সাহচর্য এবং স্বীকৃতি লাভ করা। তুলনায় কুমু তার অনড় স্বভাবধর্ম থেকে খুব একটা সরার আভাস দেয়নি। সুতরাং দাম্পত্য দ্বন্দ্বে কুমুকে দায়মুক্ত না ভেবে তারও নিরপেক্ষ সমীক্ষণ হওয়া প্রয়োজন।

কুমুর সবচেয়ে বড় অসুবিধে, সে তার মনের হদিশ ঠিকমত পায় না। প্রাক্-বিবাহ পর্বে তার মনের আদল এবং ভাবনা-চিন্তার যে ধরন ছিল, তাতে তার সংসারে মানিয়ে নেওয়াটা একেবারেই কঠিন ছিল না। তার সাবেক মনের অনুচিন্তা ছিল এইরকম :

- মা কি ছেলে বেছে নেয়? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয়, সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চলবে কার?

এতো যে ভাবে তার স্বামীকে বোঝার জন্য সে একটু সময় ব্যয় করবে না? বিশেষত যেখানে সংসারে মেয়েদেরই স্বামীর ধাত অনুযায়ী চলাটা সামাজিক বিধি! মধুসূদন এমন জটিল মনস্তত্ত্বের মানুষ নয় যে সে সব বোঝার বাইরে। তার উল্টোপাল্টা খেয়াল, স্ববিরোধী

মুডের প্রকাশগুলো দিবালোকের মতই স্পষ্ট। তবে কুমু তাকে বুঝে নেওয়ার জন্য গরজ দেখাবে না কেন!

এরপর কুমুর ব্যবহারে অস্বাভাবিকতার বেশ লক্ষণ আছে। অন্তত দুটি আচরণ বৈচিত্র তো পাঠকের কাছে পরিষ্কারই। ১. যৌন-শীতলতা বা ভীতি। বিবাহিত জীবনে সব মেয়ের কাছেই স্বামীর অজানিত যৌন-ব্যবহার নিয়ে কিছু চিন্তা থাকেই। আবার তা কেটেও যায়। বুদ্ধিমতী মেয়েরা অবস্থা বুঝে আচরণও করে। কিন্তু কুমুর মধুসূদন সংক্রান্ত যৌন-ভীতি প্রায় ব্যাধি বা অসুস্থতার সামিল। মধুসূদন তেমন কিছু যৌন-জবরদস্তি করলে না হয় একটা ভীতিজনক প্রতিক্রিয়ার কার্যকারণ গড়ে উঠতে পারতো, কিন্তু তাও তো নয়। মধুসূদনকে শয্যায় দেখলেই ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া বা সিঁটিয়ে যাওয়া একটা পুরুষ কতবার সহ্য করবে! সংসারে এমন হামেশাই দেখা যায়, প্রেমচেতনাহীন দাম্পত্যে যৌনতার সড়কপথে স্বামী-স্ত্রীর বেশ বোঝাপড়া রয়েছে। কুমু সেই সাধারণ আত্মসমর্পণজনিত আচরণ দেখায় নি। মধুসূদনের রুষ্টতার এটা একটা বড়ো কারণ।

২. আধ্যাত্মিক আবেগকে জোর করে ভেতর থেকে ঠেলে তুলে সম্বন্ধের চোরাবালিকে ঢাকার চেষ্টাটাও বেশ অস্বাভাবিক। মধুসূদনের ব্যবহারিক রুক্ষতাকে তার কর্তব্যচেতনার সঙ্গে মেলানোর কোন বাস্তবসম্মত পন্থা বার না করে শুধু গিরিধারীলালের নির্দেশিকার জন্য অপেক্ষা করা অযৌক্তিক। স্বামীকে দেহ দেওয়ার সময়ও যে মেয়ের মনে হয়, সে তৃপ্ত করছে এক অদৃশ্য কোন মানসদেবতাকে, সে তো বাস্তবে অপরপক্ষকে একধরণের প্রতারণা করাই। যেদিন দেবতার আশীর্বাদ আসবে সেদিন কেবলমাত্র সহজ হবে, মিলনোদ্যত স্বামী কি এসব তিথি-নক্ষত্রের হিসাব মেনে চলবে! ফুলশয্যার দিনে কুমুর মূর্চ্ছিতা হওয়া এবং দৈবের অজুহাতে স্বামীকে বারবার যৌন প্রত্যাখ্যান করা, এরই মধ্যে সম্ভবত দাম্পত্য-দ্বন্দ্বের পরিপক্ক বীজটি নিহিত হয়ে আছে।

কুমুর অধিকার বোধ নিয়ে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা এবং সক্রিয় রুচিজ্ঞান তাকে মধুসূদন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ঘোষাল বাড়িতে মধুসূদনের হুকুমই শেষ কথা, এর বিরুদ্ধে সে দু-বার দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। স্ত্রীর ইচ্ছা খাটানোর কোন অধিকার নেই। কেবল পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী চলার বাধ্যতাকে সে দাসত্বেরই নামান্তর জ্ঞান করে। অধিকার আহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় যে নিজেকে দাসীর ভূমিকায় নামিয়ে নিজের শয়নগৃহ ত্যাগ করেছে এবং শেজ পরিষ্কার করে খাওয়া-পরার দাম মিটিয়ে দেওয়ার পথে নেমেছে। আর একবার হুকুম পালন করার যান্ত্রিক আচরণে নেমে সে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে অধৈর্য স্বামীকে। স্বামীর একটা হুকুম তামিল করার পর স্ত্রী যদি ইচ্ছা বিবর্জিত হয়ে স্বামীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হুকুমের জন্য নিশ্চলভাবে প্রতীক্ষা করে, তবে তাকে হুকুম তামিল করা বলে না। এ একধরনের রূঢ় প্রত্যাঘাতকে সমান শক্তিতে ফিরিয়ে দেওয়া। কুমু হুকুম-নিয়মে আদ্যন্ত মোড়া এক পরিবারে আত্মস্বাতন্ত্র বহাল রাখা এবং তার identity চিনিয়ে দেওয়ার এক কঠিনতম লড়াইয়ে নেমেছিল। তার এই নিঃসঙ্গ লড়াইয়ের পাশে ঘোষালবাড়ীর কোন সহযোগীকেই সে পায়নি। ফলত তার আচরণ দ্বন্দ্ব নিরসনের বদলে তাকে উদ্বেজিত করে তুলতেই সাহায্য করেছে।

লড়াই-ই যদি কুমুর প্রথম ও শেষ কথা হতো তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু যুদ্ধে নেমে কুমু তার সাবেক মনের অবচেতন ধাক্কাটাকেও হটিয়ে দিতে পারেনি। কুমু ভেতরে ভেতরে বেশ জানে, তার অদ্ভুত অস্বাভাবিক আচরণে সাংসারিক কর্তব্যপালনে ক্ষতি ঘটছে।

এজন্য প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধ তাকে একেবারে পাপ-পুণ্যের নীতিজ্ঞানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। স্ত্রীধর্মপালনে সে পাপ করছে, অথচ আচরণকে সংযম ও নিয়ন্ত্রণে বাঁধতেও পারছে না। নিস্তারিণীর লোকাচার ধর্মকে মান্য করতেও তার মন সায় দিচ্ছে না। এই প্রতিরোধে তার আগ্রহী মন কেবলই আহত হয়েছে। সংসার করার এবং সুখ সন্ধানের ইচ্ছাটা ক্রমে ক্রমে মরে এসেছে তার মধ্যে। ফলে কুমুকে দ্বন্দ্ব-নিরসনে যত্নবান হতে আমরা কমই দেখেছি। মধুসূদন উদ্ধত আক্রমণাত্মক হলে হয়তো কুমুদিনীর ভূমিকা গ্রহণ সহজ হতো। কিন্তু রুক্ষ মধুসূদনের মধ্যে যখন নম্রতা, অসহায় কাঙালপনা ও ক্ষমাপ্রার্থনার আবেশ নেমে আসে তখনই কুমুর কাজ কঠিনতর হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর সঙ্গে সহজ প্রচ্ছন্ন আচরণের পথটাকে সে গুলিয়ে ফেলে। তাহলে অঙ্কটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে, মধুসূদন কুমুর অসাধারণত্বের নাগাল পেতে চাইছে, আর কুমু মধুসূদনের শান্ত স্বভাবকে বরণ করার পথ পাচ্ছে না। এ অঙ্কেরই শেষে যে অপ্রতিরোধ্য ব্যবধানে পৌঁছানোর কথা, এই উপন্যাসের পরিণতি একেবারে তারই অনুযায়ী হয়ে উঠেছে।

কালের দ্বন্দ্ব :

'যোগাযোগ', 'তিনপুরুষ' নাম নিয়ে বিচিত্রার দুই সংখ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, উপন্যাসের উৎস-মূলে বংশানুক্রম বা প্রজন্মবাহিতার একটা ধারণা সংযুক্ত হয়ে ছিল। তৃতীয় সংখ্যা থেকে উপন্যাসের নাম বদল করেও এ ধারণা থেকে রেহাই পাননি রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাসের বিন্যাস দেখেই বোঝা যায় মধুসূদন-কুমুর বর্তমান গল্পের পিছনে তাদের বাপ-মায়ের কালের একটা পরিষ্কার পটভূমি রয়েছে। দুই প্রজন্ম অর্থে দুই কালকে ধরা হয়েছে। এইভাবেই কালদ্বন্দ্বের একটা ধারণা তৈরি হয়েছে এই উপন্যাসকে ঘিরে।

প্রজন্ম বদলালে সব সময়ে কাল বদলায় না। আবার কাল বদল অর্থে সব সময়ে যুগ বদল নাও বোঝাতে পারে। অবশ্য কাল বলতে যদি সমাজস্তর বোঝায় তবে অন্য কথা। কেউ আবার মোটা অর্থেই ব্যাপারটাকে ধরতে পারেন। ট্রাডিশন বা ধারাবাহিকতার বদল আধুনিকতার মধ্য দিয়ে ঘটতে পারে। তখন নব প্রজন্মকে ঐতিহ্যধারার প্রতিপক্ষ ভাবা চলতে পারে। তারাশংকরের উপন্যাসে বনোয়ারি-করালির দ্বন্দ্বের মতো। সমাজবিজ্ঞানীরা অবশ্যই বলবেন উৎপাদন বিন্যাসের সামাজিক বদলের কার্যকরণ এর পিছনে নিশ্চয়ই রয়েছে। সাধারণ মানুষ খোলা চোখে তার সূত্র ধরতে পারে না এই যা। এখানে বলে রাখা ভালো, যোগাযোগের দুই পুরুষে প্রসারিত পারিবারিক বিরোধ বনোয়ারি-করালির কালদ্বন্দ্বের সমদর্শী নয়। তবু কালের কথাটাই শিল্পীর মনে বা সমালোচকের মনে যে উঠছে তার কারণ হলো এই, এই উপন্যাসের দুই পরিবার শুধুই পরিবার মাত্র নয়। এদের মধ্যে এক পক্ষ জমিদার, সুতরাং তার প্রসঙ্গে শ্রেণী সম্পর্ককে এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। এটা যদি শরিকী বিবাদের কাহিনী হতো তাহলে শ্রেণীসূত্রেই সে কাহিনীকে বাক্সবন্দী করা সহজ হতো। কেউ কেউ আরো অগ্রসর হয়ে মধুসূদন-কুমু/বিপ্রদাস বিরোধকে পরিষ্কার শ্রেণী দ্বন্দ্বের কাহিনী মনে করেন। জমিদার-বণিক সংঘাতের ছকটা যদি সত্যই থাকে, তবে কালদ্বন্দ্ব কথাটা সত্যকার অর্থব্যঞ্জনা পেতে পারে। সেটা অবশ্যই নিরীক্ষণের বিষয়।

মধুসূদন-কুমুর বিবাহ প্রস্তাবনার গোড়াপত্তন করতে গিয়ে পাত্র ও পাত্রীর বংশগত পরিচিতিকে, যাকে বলে 'পে ডিগ্রি', আলাদা আলাদা ভাবে বিন্যস্ত করে দেখিয়েছেন গল্পকার।

দুই কাহিনী নিরীক্ষণ কিন্তু এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নেই। ঘোষালদের পূর্ব উপাখ্যান [১ এবং ২ পরিচ্ছেদ] শেষ হয়েছে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের উপমা দিয়ে। সুতরাং বংশানুক্রমিক বিরোধের বীজবপনই এ পর্বের লক্ষ্য। কুমু-বিপ্রদাসের আগের প্রজন্মের কাহিনী গড়িয়েছে ৩য় থেকে ৮ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। পারিবারিক বিরোধের প্রসঙ্গ এখানে অনুপস্থিত। জমিদার মুকুন্দ চাটুজ্জের life pattern, বিশেষ করে মুকুন্দ চাটুজ্জে ও নন্দরাণীর এককালীন মনোমালিন্যের অন্তর্ভেদই এ কাহিনী বয়নের উদ্দেশ্য। হয়তো কুমুর মনে একটা অলক্ষ্যবর্তী পলিস্তর রচনাই শিল্পীর মূল লক্ষ্য।

বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্বের পরিবাহী মধুসূদন, কিন্তু হয়তো সে পূর্ব ঘটনা পরিণামের প্রত্যক্ষদর্শী নয়। এ বিরোধের সূত্রপাত পূর্বাগত কত নম্বর প্রজন্মে বলা কঠিন, তবে অনুমান, মধুসূদন-বিপ্রদাসের ঠাকুরদাদার আমলই বোধ হয় বিরোধের মূল উৎস। বিরোধের কারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতা। শ্রেণীগত ভাবে বিপ্রদাসের পূর্বপুরুষ জমিদার, আর মধুসূদনের পূর্বপুরুষ প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত উচ্চবিত্ত। প্রতিযোগিতার [প্রতিমার উচ্চতা নিয়ে] মধ্যে এদের দ্বন্দ্বর সূত্রপাত, জমিদারের প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপে দুবর্ল পক্ষের [মধুর পূর্বপুরুষ] শেয়াকুলির ভদ্রাসন হারানো এবং ভঙ্গ কৌলিন্যের সামাজিক অপবাদ অর্জন—এই হলো পূর্ব বিরোধের সীমারেখা। সূত্রপাত লগ্নে এবং পরের প্রজন্মে অর্থাৎ আনন্দ ঘোষাল-মুকুন্দ চাটুজ্যের যৌবনদশায় এই বিরোধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ধরন ছিল সামন্তবাদী। কারণ ঐ কালবন্ধনেই তাদের সামাজিক পরিপুষ্টি। প্রতিমা-বিসর্জন নিয়ে সংঘাত রক্তাক্ত সংঘর্ষে পৌঁছানোর স্টাইলটা একাল অর্থাৎ নব্যযুগের অনুযায়ী নয়। সুতরাং বংশগত বিরোধের একটা কালচরিত্র ছিল, তবে শ্রেণীচরিত্র ছিল না। জমিদার-জমিদার অথবা জমিদার-কৃষক শ্রেণী বিরোধের আওতায় আসতে পারে। কিন্তু সম অর্থযোগ্যতার দৌলতে উচ্চবিত্তের প্রতিযোগিতার দৌড়কে ঠিক শ্রেণীবৃত্তে ফেলা যায় না।

যে বিরোধ ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছিল আহত বাঘ মধুসূদন আবার তার জের টেনে তুললো। ব্যবসাবৃত্তিতে সে সামাজিক প্রতিষ্ঠার উচ্চতায় ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। প্রতিপক্ষ তুলনায় এখন সামর্থহীন। বিপ্রদাস কলসীর জলকে কোন মতে সামাল দিতে দিতে জমিদারি ঠাট-বাট আর লৌকিকতার জের টানার ভয়ে নুরনগর থেকে চলে এসে বাগবাজারে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। জমিদারি আভিজাত্যের সম্ভ্রম বজায় রাখতে গিয়ে সে শুধু কপর্দকশূন্যই নয়, দারুণভাবে ঋণগ্রস্ত। কাজেই কালান্তরে বিরোধের কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। সেদিনকার দুর্বল প্রতিপক্ষ অর্থ-প্রতিপত্তির জোরে পূর্বপক্ষকে পাল্‌টা মার দিচ্ছে চিত্রটা বোধহয় সাদামাটা ভাবে এই রকমই। কালান্তরে ক্ষেত্র বদল হয়েছে অবশ্যই। পূর্ব বিরোধের ক্ষেত্র ছিল গ্রাম। সুতরাং পক্ষ-প্রতিপক্ষকে নিয়ে সমাজবিন্যাসের একটা পুরো involvement ছিল সেখানে। বিরোধটা ছিল নুরনগর ও শেয়াকুলির মধ্যে গ্রামীণ দ্বন্দ্ব।

সংঘাতের পুনরুত্থান নগর কলকাতার পরিবেশে। ফলে পক্ষে-প্রতিপক্ষে কোন লোক-সংহতির জের এখানে আর সুলভ নয়। কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পীঠস্থান নগর পরিবেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা পরিবারে-পরিবারে বিরোধে উৎসুক মানুষজনের কোন involvement থাকে না। তাই এই বিরোধের একমাত্র দ্বন্দ্বক্ষেত্র হয়ে উঠলো নববিবাহিত নারী-পুরুষের দাম্পত্য। কার্য ও বিরোধটা পুরুষ পক্ষেই, বিপ্রদাস ও মধুসূদনের পূর্ব দ্বন্দ্বের মহড়া। অথচ তার প্রতিক্রিয়া বহন করতে হলো কুমুর নবগঠিত সংসারজীবনকে। কুমু কিন্তু মধুসূদনের শত্রুতার মূল target

ছিল না।

আগে যে দ্বন্দ্ব পাকিয়ে উঠেছিল ব্যক্তিসত্তাকে ঘিরে, কালান্তরের প্রেক্ষাপটে তা স্বভাবধর্মগত বিরোধে পর্যবসিত হলো। এ বিরোধের ব্যাখ্যা চললো এই পথে। বিপ্রদাস এক শ্রেণীসত্তা, সুতরাং অর্থ সংগতি না থাক, জমিদারিত্ব জাহান্নামে যাক, তার জীবনাচরণের ঠাট-বাটের জের চলতে থাকে অনেক দিন পর্যন্ত। একেই আমরা বলি জমিদারি আভিজাত্য, এক পৃথক গোত্রের culture। সুতরাং কুমু-বিপ্রদাসের মধ্যে এর একটা ছাপ থাকবেই। আমাদের জ্ঞাতসারে তো বটেই, অজ্ঞাতসারেও জমিদারি আভিজাত্যের প্রতি একধরণের সম্মোহ থাকেই। এ গল্পেও আছে। জমিদারের ছেলে হলেই তাকে দেবোপম দেহগঠনের অধিকারী হতে হবে, তাকে দেখে পুরাণের পাতা থেকে উঠে আসা ভীষ্ম বলে মনে হতে হবে, আর অর্থ সঞ্চায়ী বণিক বৃত্তির মানুষ হলেই তাকে লোমশ, গাঁটাগোট্টা চেহারার এবং রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ হতে হবে, শিল্পের এমন সমীকরণ সর্বত্র তো মানার যোগ্য নাও হতে পারে। এ গল্পের বিপ্রদাসের ইতিবাচক গুণবত্তা হিসাবে সৌজন্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ, মানবিক হৃদয়বত্তা, পরিশীলিত রুচিজ্ঞানের কথা আমরা অনায়াসেই ভাবতে পারি, আর তারই দর্পণে প্রতিবিম্বিত মধুসূদনের গুণহীনতাকে বড়ো করেও তুলতে পারি। কিন্তু এই জমিদারসুলভ হৃদ্‌বৃত্তি যখন কুমুকেও নিয়ন্ত্রণ করে তখন দাম্পত্যে তো তার প্রচ্ছায়া পড়তে বাধ্য।

মধুসূদনের তরফে রুচিপীড়নের যে সব কারণগুলি কুমুর মনক্ষোভের বিষয় হয়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যায় প্রবেশের পূর্বে আর একটি প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক। মধুসূদনের আচরণ বৈচিত্রগুলিকে বণিকসুলভ যখনই বলি তখনই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নব্যধনিকতন্ত্রের শ্রেণীধর্মের উপর ঐ দৃষ্টান্তগুলি বর্তায়। কিন্তু যোগাযোগ উপন্যাসে মধুসূদনকে ধনিক শ্রেণীর যোগ্য প্রতিনিধি বিবেচনা করাটা বোধহয় ঠিক নয়। তাকে অর্থসঞ্চয়ী এক বিচ্ছিন্ন careerist মানুষ বলেই মনে হয়। ঘা খাওয়া একটা মানুষ সৎ পরিশ্রমের পথ ধরেই আত্মোন্নতি গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে নব্য উৎপাদন ব্যবস্থার রূপকার পরিগণিত করতে হবে সমাজ বিজ্ঞানে এমন বাধ্যবাধকতা কোনকালেই নেই। সাধারণভাবে একথাও হয়তো মনে করা যায়, দীর্ঘ অভ্যাস ও অনুশীলনজাত দৃষ্টিমহিমা যা সামন্তপ্রভুরা অর্জন করেছে, নব্য ধনী তার ধারকাছ দিয়েও হাঁটতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয়, ধনতন্ত্রের নিজের ভেতরে কোন পৃথক জীবনশৃঙ্খলা নেই। বরং তারও বিশ্বাস-রুচির একটা প্যাটার্ন আছে। এ গল্পে সেই পৃথক ঘরানাকে ধরতে গিয়ে এমন কিছু অতিরঞ্জিত ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে যা একেবারেই হাস্যকর। নববধূকে স্বামী চেনাতে গিয়ে মোতির মা বলেছে,

- ওযে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হয়ে এক মাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিল; তারপরের দু-তিন মাস খাইখরচা পর্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে।

এই ব্যবস্থাকে কী বলা যাবে, আদর্শ সমতার ব্যবস্থা না পাগলামি। ধনতন্ত্রে মুনাফা-শিকারী বণিকরা আত্মকৃচ্ছ্র তার আদর্শ পালন করে, কিন্তু এতো মারোয়াড়িদের মধ্যেও দেখা যাবে না। রুটিন বদ্ধ জীবনে ছন্দপতন চলবে না এই হিসাব মতে ফুলশয্যার দিনেও দেউড়ির ৯টার ঘন্টা সেই বার্তা ঘোষণা করবে, এমন যান্ত্রিক উদ্ভট ব্যবস্থা কি বণিকতন্ত্রের শাস্ত্রসম্মত ঘটনা ! এরকম দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছেন, অপ্রস্তুত বণিক ধর্মের ছন্দহীনতা

এবং পরিণামে কৃষ্টিহীনতা!

এবার দেখা যেতে পারে, মধুসূদনের আচরণের কোন্ অংশগুলি কুমুর স্পর্শকাতর রুচি ও কৃষ্টিচেতনাকে আঘাত করে দাম্পত্য দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করে তুলেছে। ব্যক্তিধর্মের বাইরে কালদ্বন্দ্বের প্রচ্ছায়া অংশকে সেখানেই আমরা আবিষ্কার করতে পারবো।

কুমু-মধুসূদন সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে অধিকার জ্ঞান, রুচিবোধ, আত্মসম্মান এবং মানবিক হৃদয়বত্তার প্রশ্ন। এগুলি সবই কুমুর মধ্যে দারুণভাবে লভ্য, আর মধুসূদন জ্ঞানে-অজ্ঞানে আহত করে ফেলেছে এই চিত্তবৃত্তিগুলিকেই। ধরে নেওয়া যেতে পারে, কুমুর এই ভাব-স্পর্শকারতা তার রক্ত সূত্রেই পাওয়া। কুমু জেনেছে এ বাড়িতে কর্তার বিনা অনুমোদনে কারুকেও হাত তুলে কিছু দেওয়ার অধিকার তার নেই। সে কাজের লোকের জন্য নিজের ব্যবহৃত শীতের আলোয়ান বা সামান্য এক কাচের পেপারওয়েট যাই হোক্ না কেন। ক্ষুণ্ণ কুমুর এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তর্কও হয়ে গেছে। প্রসঙ্গ : দাদার দেওয়া নীলার আংটি।

- তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে, আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?

  এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।

  কিছু নেই? তবে রইল তোমার এই ঘর পড়ে।

স্বাধীনতাবোধ তার স্পর্শকাতর, তাই তার এতো তীব্র প্রতিক্রিয়া। দৈনন্দিনতার মধ্যে এই সংঘাতের বীজকে ক্রমে উপ্ত করে তোলায় কালগত দ্বন্দ্বের ছায়াপাত অবশ্যই রয়েছে।

মানবিক হৃদয়বত্তার স্বাভাবিক টানে কুমু একদিন মুরলী বেহারাকে নিজের ব্যবহৃত আলোয়ানটা দিয়ে দিয়েছিল। মধুসূদন পরে জানতে পেরে ঐ আলোয়ানটি চেয়ে নিয়ে মুরলীকে নগদ একশো টাকা উপহার দিলো। বলা বাহুল্য এভাবে সংবেদনশীলা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

কুমুর রুচিবোধ অত্যন্ত প্রখর। এ নিয়ে তার গর্বও আছে। এ সম্পর্কিত তার সূক্ষ্মতাবোধ কখন মাত্রাবোধকেও ছাপিয়ে যায়। স্বামী সহবাসের ঘটনাকে আধ্যাত্মিক নিবেদনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে, সোজা কথায় পাশব বাসনাকে কলাসৌন্দর্যমণ্ডিত করতে গিয়ে সে স্বামীর অধৈর্যের কারণ ঘটিয়েছে। তার স্বয়ংক্রিয় রুচিজ্ঞান প্রতিপদে আহত হয়েছে ঘোষাল বাড়ির নিয়মনীতির কাছে। কলহ-বিবাদে মোটেই রপ্ত নয় কুমু। যে কোন সংঘাতকে বাদানুবাদের উত্তেজক মাত্রায় পৌঁছে দিতে তার রুচিই তাকে বাধা দেয়। কুমু রুচি নিপীড়নের মধ্যে মর্যাদাহীনতার গন্ধ পেয়ে নিজেকে শীতলতর ঔদাসীন্যে গুটিয়ে নেয়। মধুসূদন অন্তত দু-বার অসৌজন্যমূলক কথাবার্তায় তাকে উত্যক্ত করেছে। ৪৫ পরিচ্ছেদে এক রাতে স্বামীকে অকস্মাৎ শয্যায় দেখে সদ্য ঘুম ভাঙা কুমু ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের মনান্তর পৌঁছেছিল চূড়ান্ত জায়গায়। এমনই এক ক্রুদ্ধ মুহূর্তে মধুসূদন বলে বসলো :

- ....মাপ চাইতেও জান না?

  কিসের জন্যে?

  তুমি যে আমার এই বিছানার উপরে শুতে পেরেছ তার জন্যে।

এই বক্তব্যের ইঙ্গিতার্থে কুমু সেদিন মানবাত্মার চরম বেদনাবোধ করেছিল। কুমুর স্বামী বিবিক্ততার এটাই চূড়ান্ত মুহূর্ত ছিল। এরপরই বিচ্ছেদের সূচনা ঘটে। আর একবার দাদার বাড়ীতে অবস্থানকালে কুমুকে ঘটা করে ফিরিয়ে আনতে যায় মধুসূদন। সেদিন কুমুর প্রত্যাবর্তনের অনিচ্ছা প্রকাশ পাওয়ায় পুলিশ ডেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে ছিল

মধুসূদন। এটা তবু সহ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু এরপর বিপ্রদাসকে অপমান করার মুহূর্তে কুমুর সমস্ত স্পর্শকাতরতা-প্রতিবাদ করে উঠলো।

...তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি? জান এই মুহূর্তেই ওকে পথে বার করতে পারি।

কুমু স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, তার স্বামী মানবিক হৃদয়বত্তাকে ভুলে শালিনতার নিম্নস্তরে নেমে গিয়ে কদর্য বিরোধকে পাকিয়ে তুলতে পারে। জমিদারি এবং একই সঙ্গে সাধারণ আত্মসম্মানবোধ সেদিন ভাই-বোনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছিল। কুমু আর স্বামী গৃহে ফিরবে না, এই ছিল সেই মুহূর্তের অনড় সিদ্ধান্ত।

এই দৃষ্টান্ত বিশেষ থেকে অতঃপর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এক পক্ষে [বিপ্রদাস-কুমু] সমস্ত মানবিক মূল্যবোধকে গচ্ছিত রেখে এবং অপরপক্ষে [মধুসূদন] অর্থগর্বে দম্ভভারে ঐ সমস্ত মূল্যবোধকে নস্যাৎ করিয়ে পারস্পরিক বিরোধের একটি ছককে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করে দাম্পত্য দ্বন্দ্বের তলায় [under the carpet] রেখে দিয়েছিলেন। এজন্যই কালগত রুচি ব্যবধান পিছন থেকে দ্বন্দ্বকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই কালদ্বন্দ্বের দিকে নজর রাখলে কিন্তু মনে হয়, কুমু-মধুসূদনের মনস্তাত্ত্বিক লড়াইকে আমরা যে গভীরতার মাত্রা থেকে দেখি, ততটা মূল্য এই দ্বন্দ্ব-পরিকল্পনার পাওনা নয়। ছকের সূত্রের সঙ্গে মেলালে বরং একে সহজ বলেই মনে হতে পারে।

মধুসূদন :

মধুসূদন একালের বেনিয়া। আহত বাঘের মতো সে ঐতিহ্যের ধাক্কা খেয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে একালে। রজবপুরে ব্যবসার মক্‌সো করতে করতে সে আজ কালকাতার business magnet রাজাবাহাদুর খেতাব তার মুঠোর মধ্যে। প্রতিষ্ঠা অর্জনের একটা পর্ব চুকিয়ে তার দ্বিতীয় পর্বে [সংসারাশ্রমে] পা বাড়ানোর সূত্রপাত থেকেই সে উপন্যাসের ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ এই মধুসূদন ঘোষাল।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদন এক স্ববিরোধী চরিত্র। শ্রম, সাহস, কৃতিত্বের খতিয়ান একদিকে, অন্যদিকে একতরফা স্ফীতির কারণে ভারসাম্যহীনতা ও সুকুমার মনোবৃত্তির অপুষ্টি—এই দুই বিপরীত ভাবের আবর্তে নিয়ত দ্বন্দ্বমান চরিত্র মধুসূদন। রবীন্দ্র উপন্যাসে আর কোন স্বামী এরকম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েনি। আলোড়িত ছিল মহেন্দ্রর জীবন, কিন্তু সেখানেও শান্ত সুনির্ভর দাম্পত্যের গ্যারান্টি তার ছিল। আশা তো তারই আপ্লুত ভালোবাসায় নিয়ত স্নান করেছে। মহেন্দ্রের উন্মার্গগামিতাই তাকে সাময়িকভাবে দাম্পত্যচ্যুত করেছিল। তার জীবনে দাম্পত্য tragedy হয়তো তার সজ্জনতারই অনিবার্য পরিহাস। নিখিলেশ, নলিনাক্ষরা প্রেমিক এবং স্বামী। তাদের উদারতা এবং ক্ষমাসুন্দর প্রেমের দৃষ্টান্ত আদর্শ স্থানীয়। শ্রীবিলাস একবছরের অতৃপ্ত দাম্পত্যে শতাংশে উত্তীর্ণ স্বামীত্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এদের তুলনায় মধুসূদন ভগ্ন দাম্পত্যের সাক্ষী, অভিযোগের তীর সর্বক্ষণ তার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে। কিছু অস্বাভাবিকতা এবং অধৈর্যপরায়ণতার ত্রুটি সত্ত্বেও তার মানবিক হৃদয়বত্তা সর্বত্র অনুপস্থিত নয়। তার অপরিণত বুদ্ধি বরং পাঠকের উপভোগেরই বিষয়। নারী মনস্তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জেদী একটি মানুষ স্বামীত্বে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, অথচ

আনুগত্যে বা বশ্যতায় [প্রেমে অবশ্যই নয়] স্ত্রীকে কব্জা করতে পাচ্ছে না, এর খণ্ডচিত্রগুলি তার অসহায়তার প্রমাণ দেয়। একটু নিরপেক্ষতা নিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সে আমাদের কৃপা কিম্বা সহানুভূতির পাত্র হয়ে উঠতে পারে।

উদ্যমী কৃতী পুরুষ মধুসূদন। Careerism এর জ্বলন্ত আদর্শ। ব্যবসা তার স্বপ্নভূমি। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই লেনদেনভরা গঞ্জের পরিবেশ তাকে টানতো। স্বপ্ন থেকেই জন্ম নেয় তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্বপ্ন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিলিত হলেই জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়। এর সঙ্গে পরিস্থিতির ভূমিকাও যুক্ত হয়েছিল তার জীবনে। বাস্তুচ্যুতির খেদ সঞ্চারিত হয়েছিল তার রক্তে। ফলে একচোখা এক লড়াকু মানুষের জন্ম হয়েছিল তার জীবনে। কেরোসিনের এজেন্সি দিয়ে তার হাতেখড়ি। পরে পাটের সাম্রাজ্য এবং তারও পরে Business King হওয়ার জন্য অন্যান্য পথে তার অভ্রান্ত পদক্ষেপ। তিরিশ বছরের মধ্যেই এক নিরবচ্ছিন্ন পরিক্রমায় আজ সে রাজাবাহাদুর।

পৈতৃক সম্পত্তির ওয়ারিশন সূত্রে মধুসূদন সম্পদশালী নয়। সম্পূর্ণ স্বোপার্জিত ঐশ্বর্য তার। সুতরাং ঐ প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণের জন্য সে যত্নবান এবং অতিমাত্রায় সতর্ক। এই সজাগ প্রহরার প্রতিক্রিয়া থেকে বেনিয়া মধুসূদন কতগুলি স্বভাবধর্ম অর্জন করেছিল। আর এগুলি নিয়েই তার সঙ্গে কুমুর চরম সংঘাত। আত্মগর্বিত মধুসূদনের Igoist হওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। সংসারে ৯০ শতাংশ মানুষই তা হয়ে থাকে। বিশেষ করে দারিদ্র্য মাড়িয়ে যারা বড়ো হয়, প্রথম প্রথম হিসাবে তাদের মধ্যে ঐরূপ চিত্ত প্রতিক্রিয়া তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মধুসূদন প্রভুত্ব বাদে বিশ্বাস করে। তার ধারণা প্রভুত্ব দিয়েই অজর্ন করা যায় শৃঙ্খলা এবং প্রার্থিত বশ্যতা। এ জন্য শুধু ব্যবসা ক্ষেত্রেই নয় সংসারেও ঐ অব্যর্থ মহৌষধি সে প্রয়োগ করেছে। ভোর থেকে শয়নকাল পর্যন্ত ঘোষালবাড়ির প্রভু থেকে ভৃত্য পর্যন্ত সবাই এই হুকুমের অধীন। স্ত্রী-পরিজনেরাও এই আওতার বাইরে নয়। কোন মমতার বশেও এই নিয়মভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নেই মধুসূদনের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তার এই প্রভুত্বপরায়ণতাকে বেশ চড়া রঙেই ধরতে চেয়েছেন। ফলে অতিরঞ্জিত ব্যবস্থাগুলোতে অবাস্তবতার ছোঁয়া লেগেছে। প্রভুত্বের অর্থ যদি হয় স্বাধীনতা হরণ, তবে মধুসূদন সে নিয়ম নিজের ওপরেও প্রয়োগ করে। কামাই হলে ফাইন হিসেবে নিজের প্রাপ্যের অংশ থেকে সে জরিমানা বাদ দেয়, বেশী দিনের অনুপস্থিতি হলে রোজগারের কমতিটা পুষিয়ে নেয় নিজ ব্যয়ের হিসেব ছাঁটকাট করে। এই পদ্ধতিগুলিতেই রয়েছে বাড়াবাড়ি। সতর্কতা ও প্রহরা এ মাত্রায় চলে গেলে তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বাতিকগ্রস্ততাই বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নায়ক চরিত্রটির স্বভাবধর্মের এই অংশটাতে অন্ধ বাতিক বাসা বেঁধেছে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যবসায়ে অনন্যমনা মধুসূদন জীবনের লক্ষ্য অর্জনে একচক্ষু বিশিষ্ট হতে গিয়ে নারী সম্বন্ধে লক্ষনীয় ভাবেই অনাগ্রহী হয়েছিল। তার কর্তব্যনিষ্ঠায় এমন কোন ফাঁক সে রাখেনি যেখান দিয়ে বসন্তবাতাস প্রবেশ করে কিছুক্ষণের জন্যেও তাকে উন্মনা করে দিতে পারে। এ জন্যই মধুসূদনের জীবনে নারী সম্পর্ককে ঘিরে কোন মোহ স্বপ্ন কিম্বা সংস্কার দানা বাঁধেনি। হয়তো বিবাহও তার কাছে সম্পদ অর্জনের মতো এক নৈমিত্তিক ব্যাপার। এজন্য বাড়তি কোন চিত্তসঞ্চালনের প্রয়োজন আছে বলে তার মনে হয় না। এই প্রবণতাকে বেনিয়া বৃত্তির অনুষঙ্গ ভাবলে ভুল করা হবে। এও এক ধরণের absurdity, শিল্পী নিজে তাঁর নায়ককে উপহার দিয়েছেন। এতে তাঁর দ্বন্দ্ব পাকিয়ে তোলার কাজটা সহজ হয়েছে। পাত্র যদি মানসিক

আবেশমুক্ত রুটিন যৌনতার অধীন হয়, আর পাত্রী যদি মানসিক আবেগসর্বস্ব এবং যৌন-শীতলতার শিকার হয়, তবে পরস্পর বিপরীত স্বভাবের দ্বন্দ্বটা জমে উঠতে পারে সহজেই।

এখানে আমরা যেন মধুসূদনকে অপূর্ণ পৌরুষেয়তার দায়ে না ফেলি। মধুসূদন ইন্দ্রিয়গতি পথরুদ্ধ কোন অপূর্ণ মানবক নয়। বিলম্বে হলেও পঞ্চশর তাকে আচ্ছন্ন করেছে। অব্যবহৃত অনুভূতিতে যৌবন তথা বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। যাকে নিমিত্তার্থে স্ত্রী বলে মনে হয়, যাকে বংশানুক্রমিক বিরোধের ঘুঁটি ছাড়া আর কিছুই মনে করার কথা নয়, উত্তর যৌবন দশায় মধুসূদন তারই যৌবনশ্রীর অসাধারণত্ব খুঁজে পেয়ে মুগ্ধ হলো। প্রভুত্বকামী আপোষহীন বিরোধের সৈনিক মধুসূদন যতটুকু নম্র ও নত হয়েছে তা ঐ মুগ্ধতারই কারণে। অব্যবহৃত যৌবনের অবদমিত জৈবতৃষ্ণার দিকটাও ছিল একই সঙ্গে প্রখর। বরং বলা ভালো, মধুসূদনের কুমু-মুগ্ধতা কখনই তার মূল জৈবতাকে ঢাকা দেওয়ার মতো জোরালো হয়ে উঠতে পারে নি। তাই মুগ্ধতার আবেশকে অতিক্রম করেই জৈবতৃপ্তির সাধারণ উপকরণ হিসাবেই সে বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছে কুমুকে। রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার তার যৌনক্ষুধার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। কিন্তু তাও এমন এক মাত্রায় বাঁধা যে কখনও মধুসূদনকে লম্পট বা যৌন-নিপীড়ক বলে মনে হয়নি। স্থূল ব্যবসাদার মানুষটি যৌন সম্পর্কের পথেই নববিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনার পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। এজন্যই কুমুকে জয় করার প্রয়াসে হতোদ্যম মধুসূদন অবশেষে একদিন ভেবেও ফেলেছে, সন্তানের রাস্তাই অপ্রাপণীয়াকে জয় করার একমাত্র রাস্তা।

এই সূত্রেই বলা যায়, একটা হীনম্মন্যতাবোধও মধুসূদনকে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ করছিল। নিজের দেহশ্রী সম্বন্ধে একটা ক্ষুণ্ণতাবোধ সব সময়ে তাকে ঘিরে রেখেছিল। তাই স্ত্রী যৌন প্রত্যাখ্যানের সময় তার মনে হয়েছে কুমু তার অতিক্রান্ত বয়স এবং লোমশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারাটাকে আদপেই পছন্দ করছে না। এখান থেকেও তার ক্রুদ্ধতা ঘনীভূত হয়েছে বলে মনে করা যায়।

মধুসূদন ভীষণভাবে ভাগ্যবাদী। পুরুষকার দিয়ে সব কিছু অর্জন করেও মধুসূদন আস্থা-পরায়ণতাকে সেভাবে অর্জন করতে পারেনি। ভাগ্যের মার নিয়ে তার মধ্যে একটা চোরা ভীতি আছে। এজন্যই কুমুর সঙ্গে নীলার আংটি নিয়ে তার বিবাদ। সর্বক্ষণ আত্মরক্ষণপ্রয়াসী মধুসূদন মনে করে, স্ত্রী যেহেতু স্বামীরই অর্ধাঙ্গ, সুতরাং স্বামীর সহ্য না হওয়া রত্ন তার সঙ্গে থাকলেও অকল্যাণ তার স্বামীকে ঘিরে ফেলবে। অধৈর্য মধুসূদন ঐ আংটির সঙ্গে কুমুর দাদার স্মৃতি জড়িত, একথা জেনেও আত্ম-কল্যাণের ভয়ে প্রশ্নটিকে আমল দেয়নি। অন্য দিকে কুমুও ভাগ্যভীত মানুষটির মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য প্রতীক্ষা করেনি। এই সদাসতর্ক শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটির ভাগ্য-ভীতি নিয়ে নবীন কত হেলায় প্রতারণার খেলায় মেতেছিল। মেকি জ্যোতিষী বেঙ্কটস্বামীর নির্দেশিকা মানার পদক্ষেপগুলিতে এই লড়াকু মানুষটির অভ্যন্তরীন দুর্বলতার দিকটি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। ভাগ্যবাদী মানুষেরা বিপদ বা সঙ্কটের বাহ্য দৈব যোগাযোগকে বড় করে দেখে অভ্যন্তরীণ কার্যকারণের অনুসন্ধানে উৎসাহ হারায়। মধুসূদনও এই বিড়ম্বনার ভাগী হওয়ায় দ্বন্দ্ব-অতিক্রমের পথে বিচারবুদ্ধিসহ পা বাড়ায়নি।

মধুসূদন স্বভাব প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। কিন্তু বংশানুক্রমিক বিরোধের জের টানতে গিয়ে ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির জোরে সে চাটুজ্জেদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বিপ্রদাসের সঙ্গে এক ছায়া-যুদ্ধ চালিয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন তার জীবনের প্রথমভাগের লড়াই, আর ঘৃণিত প্রতিপক্ষকে অপমান-অসম্মান করাটা তার জীবনের উত্তরপর্বে দ্বিতীয় লড়াই। এই লড়াইয়ে মধুসূদনের

উত্তেজনার ভাগ অনেকটাই, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাও অনতিগোচর নয়। প্রকৃত লড়াই হলে ক্ষমতাশালী মধুসূদন বিপ্রদাসকে প্রকৃত হেনস্থা করার অনেক পথই অবলম্বন করতে পারতো। কিন্তু মধুসূদন নগ্ন রুচিহীন নয় বলেই তা করতে পারেনি। যে শত্রুবংশের সঙ্গে সে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়েছে তার সঙ্গে প্রকাশ্য নগ্ন লড়াই বাইরে গেলে বাহ্য সমাজে দুই পরিবারেরই মুখ পোড়ে। এটুকু সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান তার আছে। এজন্যই এই লড়াইয়ের গর্জন এবং হুমকিগুলি বর্ষিত হয়েছে সংসারের সংশ্লিষ্ট তিন পক্ষের মধ্যেই [বিপ্রদাস-কুমু-মধুসূদন]। আর এই কারণেই একে ছায়া-যুদ্ধ বলেছি। এই ছায়া যুদ্ধেরও দাম আছে। পিতৃপুরুষের অবমাননার প্রতিশোধ তুলছি একথা ভেবে আনন্দ ও উত্তেজনা পাওয়া যায়। আর একটু গভীরে নামলে বলা যায়, সমর্থ প্রতিপক্ষকে টলাতে না পারায় পরাভবের লজ্জাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য গর্জনকে দ্বিগুণিত করা যায়। কুমু একবার মধুসূদনের প্রত্যক্ষ অপমান চেষ্টার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।' যাকে অপমান করেও টলানো যায় না সেখানে স্ফীত গর্বে সুর চড়ানো ছাড়া উপায় কী! আরো লক্ষণীয়, নুরনগরী চাল ভেঙে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ছাড়া কুমুকে কখনোই সুযোগমত পীড়নের লক্ষ্য করেনি মধুসূদন। কুমুর অস্তিত্বের চারপাশে বিপ্রদাসের ছায়াবৃত্তের [shadow circle] নির্মোকটা ভাঙতে পারছে না, যোদ্ধা মধুসূদনের এটাই চরম দুঃখ। তাই পিছনের ছায়াকে আঘাত করতে গিয়ে দু-একটা অনিচ্ছাকৃত আঘাত কুমুর উপরেও গিয়ে পড়েছে।

মধুসূদনের প্রচার পরায়ণতা এবং প্রতিহিংসাময় উদ্যোগের দিকে তাকালে মনে হয় মধুসূদন যেন এক বয়স্ক শিশু। তার আচরণগুলি এতই অসলগ্ন যে তাকে ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। নুরনগরে পরিত্যক্ত পিতৃআবাস পরিষ্কার করে তার ঘটা করে বসার একটা গুহ্য অর্থ থাকতেই পারে। সহৃদয়ী বিপ্রদাস একথা বুঝেই তার বাড়াবাড়ির কাজগুলিকে ক্ষমা করেছিল। দীর্ঘকালীন আহতচিত্ততাকে মলম দেওয়ার এ এক ধরণের প্রক্রিয়া। কিন্তু তাই বলে মধুমতী, মধুকরী, মধুচক্র, মধুসাগর, মধুকুঞ্জ, মধুপুরী এতো মধু নামের লেবেল আঁটা! গৃহ, জলাশয়, বাগান, নৌকা কিছু বাদ নেই! দেখে কি মনে হয় না একটা বিতাড়িত মানুষ সব অপমান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শিশুর মতো দুয়ো দিচ্ছে? আবার শ্যালকের বাড়ীতে দাঁড়িয়েই স্ত্রীর কাছে হুঙ্কার ছাড়া—'জান এই মুহূর্তেই ওকে পথে বার করতে পারি।' এই উক্তিরই বা কি মানে হয়। গায়ের ঝাল মেটানোর এক সুলভ প্রয়াস, নয় কি?

মধুসূদনের চরিত্রে আরো তিনটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলিকে তার দাম্পত্য-ছেদনের হেতু বলে মনে করা যায়। **ক.** মানুষকে সহজ মূল্যে কেনা যায় এই বোধ, **খ.** বিচারবোধের অভাব, গ. অধৈর্যপরায়ণতা। এগুলিকে ব্যবসাবৃত্তি সঞ্জাত বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না। নগদ কারবারি মানুষ হাতে হাতে সব কিছু পেতে থাকলে তার মধ্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আসা সম্ভব। কুমুকে অধিগত করার জন্য মধুসূদন উপহার উৎকোচের পথ ধরেছিল। হাবলুর কাছ থেকে এলাচদানা পাওয়ায় আপ্লুত কুমুকে রূপোর প্লেটে সাজিয়ে এলাচদানা উপহার দিয়েছে সে, বিপ্রদাসের নীলার আংটি হারানোর খেদ মেটানোর জন্য একসঙ্গে মূল্যবান পাথর বিশিষ্ট তিনটি আংটি উপহার দিয়েছে কুমুকে, ভেবেছে তার অক্ষিগোলক তৃষ্ণায় লোভে ফেটে বেরিয়ে আসবে। অথচ বিচারবুদ্ধি প্রবল হলে প্রথম ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকেই মধুসূদন বুঝে নিতো অজেয় নারীকে জয় করার এটা পন্থা নয়। বিচার বিশিষ্ট হলে সর্বাগ্রে তার এটাই ভাবা উচিত ছিল, অল্প বয়সে মা-বাপ হারা মেয়েটির জীবনে

দাদাই একমাত্র ধ্রুবতারা, সুতরাং বিপ্রদাসকে খুঁচিয়ে কুমুর মন পাওয়া যায় না। অধৈর্যপরায়ণতা মধুসূদনের আর এক দোষ। ভিন্ন ধাতু প্রকৃতির অন্তর্মুখী মেয়েটিকে সইয়ে সইয়ে গ্রহণ করতে হবে, অধিকার প্রভুত্বের জোরে তৎক্ষণাৎ পেতে চাইলে হবে না, মধুসূদন এজন্য একটুও ধৈর্যপরায়ণ হতে চাইনি। এজন্যই দাম্পত্য মিলন সম্ভাবনা ক্রমেই দূরীভূত হয়েছে।

মধুসূদনের চরিত্রে অন্য দিক থেকে দুটি সদ্‌ গুণ রয়েছে।—ক. কুমুর প্রতি মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধাভাব, খ. আশ্রয়লিপ্সা। পূর্বেই বলেছি কুমুর অনিন্দ্য যৌবনশ্রীর প্রতি একটা সম্মোহনভাব তৈরি হয়েছিল মধুসূদনের মনে। কুমুর আচরণে চরমতম বিরক্তির সময় এই সম্মোহনজনিত মুগ্ধতাবশেই মধুসূদনের রূঢ় ব্যবহারে চকিত পরিবর্তন আসতো। কুমুর কাছে নম্র বা নত হওয়াটা তার ব্যক্তিত্বের কাছে নয়, তার [কুমু] অসাধারণত্বের বাতাবরণের কাছে। 'মাপ করো', 'দয়া করো', ইত্যাদি প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা এসেছে কুমুর প্রতি শ্রদ্ধাজনিত সম্মোহ থেকেই। ৩৫ পরিচ্ছেদে একসঙ্গে তিনটে আংটি উপহার দিতে গিয়ে আঘাত খাওয়া মধুসূদন বিমুখ স্ত্রীর মন পাবার জন্য '...তখনই এসে বসল মেঝের উপরে তার পায়ের কাছে।...বললে, 'উঠো না, শোনো আমার কথা। আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেছি।' আবার একটু পরেই মিলন লিপ্সায় কুমুর টালবাহানায় উদ্ধত মধুসূদন শান্ত হয়েছে কুমুর পবিত্রশ্রীর কাছে। 'কী একটা দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা! যেন নির্জন তুষার শিখরের উপরে নির্মল ঊষা দেখা দিয়েছে।' গভীর দ্বন্দ্বের মুহূর্তে মধুসূদন কাতরভাবে বলেছে, 'আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না?' প্রভুত্বকামী ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব নুরনগরের মেয়ের কাছে তার দোষ এবং অযোগ্যতা স্বীকার করে ক্ষমা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করছে, এই অসম্ভব কাজ কেবল সম্ভবপর হয়েছে কুমুর অনির্বচনীয় দিব্যরূপের কাছে শ্রদ্ধা থাকার দরুণ। মনে হতেই পারে, মধুসূদনের রুক্ষতা এবং মাপ চাওয়াটার ধরনটা হিস্টিরিক, এও মনে হওয়া সম্ভব কুমু এক জাতের হিস্টিরিক, মধুসূদন আরেক জাতের। কিন্তু কখনও ভাবা চলে না, মধুসূদন কুমুকে শ্রদ্ধার আসন থেকে কখনও নিচেয় নামিয়েছে। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে নিজ সাহচর্যের মধ্যেও কুমুর অবস্থানভূমিকে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করে গেছে মধুসূদন। কুমুর পরিত্যক্ত স্থান দখলের জন্য সাহস জোগায়নি শ্যামার মনে।

মধুসূদনের কুমু সংসর্গের আগ্রহাতিশয্যে আর একটি মনোভাব অভিব্যক্ত হয়েছে। সে তার আশ্রয়লিপ্সা। যদি প্রতিষ্ঠার দৌড়ে বিজয়ী মধুসূদনকে এক ক্লান্ত নিঃসঙ্গ নায়কের চোখে দেখি, তবে তার চিত্তের গভীরে আশ্রয় লোলুপতা থাকা খুবই সম্ভব। কুমুর চারধারে বেড় দেওয়া পবিত্রশ্রীর লক্ষণ রেখাটিকে মধুসূদন একদিকে যেমন ভয়ই করেছে, তেমনি ঐ অলভ্যার কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতাও তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। নম্রতার সুরে তার কণ্ঠের দরদী আহ্বানে বার বার কুমুও শিহরিত হয়েছে। কুমু যখন দাদার আশ্রয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তখনই তাকে ফিরিয়ে নিতে আসা মধুসূদন একান্তে স্ত্রীকে মিনতি করে বলেছে, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী! শূন্য ঘর কি ভালো লাগে?' বিড়ম্বনা এই, মধুসূদন যতবার নমনীয় হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ততবারই পরের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার প্রতিবারের উদ্যোগ খড়কুটোর মতে ভেসে গিয়েছে। মধুসূদনকে কোমল চিত্তবৃত্তির মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে আমাদেরও অসুবিধে হয়েছে। আসলে স্বয়ং শিল্পী দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করার কৌশল হিসাবে যদি কোমলতা ও রুক্ষতা বৃত্তির ঘন সহাবস্থানকে উপর্যুপরি ব্যবহার করতে থাকেন, তাহলে চরিত্র তো নিরুপায় হয়ে পড়েই, আমাদেরও কিছু করার

থাকে না। মধুসূদনের সমগ্র চরিত্রভূমিকাটি একই অপরিবর্তিত চরিত্রস্বভাবের বহিঃপ্রকাশ হওয়ায় একঘেয়েমি পাঠক মনেও অনিবার্যভাবে বাসা বাঁধে। পাঠক যদি জেনেই ফেলেন মধুসূদন রুক্ষতার পরে নম্রতা এবং তার পরে আবার রুক্ষতা এই ছকে অভিনয় করে চলবে, তাহলে বৃত্তাকার চরিত্রের শিল্পস্বাদ থেকে বোধ হয় আমরা বঞ্চিতই হই। চরিত্র যদি আচ্ছাদনের গভীরে মনস্তাত্ত্বিকতার অতলে আমাদের আকর্ষণ না করে তা হলে জীবন আবিষ্কারের আনন্দ থেকে আমরা বহুদূরে সরে যাই।

কুমুদিনী :

রবীন্দ্র নায়িকারা নাগরিকা, বিদগ্ধা, আত্মমর্যাদা সম্পন্না এবং ব্যক্তিত্বময়ী। বিনোদিনী, হেমনলিনী, সুচরিতা, দামিনী, বিমলা, লাবণ্যদের সমীহ না করে আমাদের উপায় নেই। সংযমে এবং সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণে এরা সবাই আদর্শস্থানীয়া। আশা, কমলা, ললিতা, আনন্দময়ী, যোগমায়ারাও কিছু কম যান না। কুমুদিনীর চরিত্রধর্মও এদের সঙ্গে একই ছন্দ-স্বরগ্রামে বাঁধা।

কুমুদিনী উনিশ বছরের রুচিশীলা ব্যক্তিত্বময়ী নারী। এর ধাতুপ্রকৃতি অনুসন্ধান সব চেয়ে জরুরি। কেননা কুমুর জীবনদ্বন্দ্বের সমস্ত কারণ ঐ ধাতের গভীরেই লুকিয়ে আছে। অন্ধ মধুসূদন এদিকটায় একেবারেই নজর দিতে চায়নি। নাবালিকাদের তুলনায় ব্যক্তিত্বময়ী সাবালিকাদের মানিয়ে সংসার করা অনেক বেশি কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ একথা বুঝেছেন এবং আমাদেরও বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রথমেই বোঝা দরকার, কুমুর ভিত্তি বংশগতির মধ্যেই। কিন্তু তার মনের ডালপালা বাইরের দিকেই ছড়ানো। এতে তার মনের আলোকপ্রাপ্তিতে সুবিধে হয়েছে, মনোধর্মে সে রুচিশীলা হয়েছে, কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মুক্ত চেতনার প্রেরণা কাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বার-ব্রত, লৌকিকতা, আভিজাত্য, মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপনের রীতি এই সব কিছু জড়িয়ে যে সামন্ত জীবন সংস্কার তৈরি হয়, কুমু মূলত তারই অধিগত। বাল্যেই মা-বাপকে হারানো (তাও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহের চূড়ান্ত পরিণামে) এবং দাদার অভিভাবকত্বে এসে পড়া, এর মধ্যে স্বাধীন প্রবৃত্তি বিকাশের সুযোগ কমই থাকে। এসব ক্ষেত্রে স্বভাবধর্ম অন্তর্মুখিনতার দিকে মোড় নেয়, প্রথাগতি ছাড়া অন্য কিছুকে বরণ করার মতো আগ্রহ থাকে না। অন্তর্মুখী কুমু যদি মানসিক পরিণতিলাভের পর স্বাভাবিক ভবিতব্যতায় বিবাহের পিঁড়িতে চড়ে বসতো, তবে তার আপোষ-সামঞ্জস্যে বিশেষ অসুবিধা ঘটতো না। কিন্তু বিপ্রদাস স্নেহের বোনটিকে স্ব-শিক্ষার আলো দেখালেন। সামন্তবাদী মনের উপর সাহিত্য ও কলাচর্চার পালিশ পড়লো। ঘরকন্না এবং সন্তানধারণ ছাড়াও নারীর মানসবিকাশের আরো অনেক ক্ষেত্র আছে বন্দুক চালনা, ছবি তোলা, ঘোড়ায় চড়ার প্রকাশ্য অভ্যাস দিয়ে কুমু তা হৃদয়ঙ্গম করলো। সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ নিয়ে, এস্রাজ বাজাতে শিখে কুমুর বিশদভাবে মনে হলো পুরুষের কর্মযোগের পাশাপাশি নারীরও কর্মধারার এক সমান্তরাল ক্ষেত্র আছে। এই অনুভবের অংশে কুমু শতাংশেই আধুনিক। কিন্তু আগেই বলেছি, কুমুর মনের নিচের অংশ সাবেক প্রথাগতির সঙ্গে একেবারে গাঁটছড়া বাঁধা। দুই বিপরীত মেরুর শিক্ষা-রুচির সমীকরণ [assimilation] তার মধ্যে ঘটেনি বলেই, কুমু ঘোষালবাড়ির কাছ থেকে অনেক কিছু দাবি করেছে, কিন্তু বিপরীতে আলোক প্রাপ্ত মুক্তবুদ্ধির সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পারেনি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে।

চৌত্রিশ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

- কুমুদিনী ঘরে পড়াশোনা করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরানো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস।

যাবতীয় ধর্ম-কৃত্য, আচার-সংস্কার, দৈব বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি কুমুর মান্যতার ভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। বিপ্রদাস দৈববাণী মানেন না। শিক্ষাগুরুর এই অনাস্থা জেনেও কুমু তার মধ্যে দাদার দৃষ্টিক্ষীণতাই সন্ধান করে। এহেন কুমুর চরিত্রধাতুকে রবীন্দ্রনাথ বিবাহ প্রস্তুতি পর্বেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। জ্যোতিষবচন এবং বাঁ চোখ নাচার লক্ষণ ধরেই স্বয়ম্বরা কুমু নিজেই তার পাত্র নির্বাচন করেছিল। এ বিষয়ে তার মনের গভীরতম অংশের ছবিটা ছিল এইরকম—

- অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।

নিজের নায়িকা সম্বন্ধে শিল্পীর এই যদি version হয়, তবে বলতে হয় কুমুদিনীর তো কোন সমস্যাই নেই। তার আগামী দাম্পত্য সরল ও স্বচ্ছন্দ হবে। কিন্তু এই সাবেক মন্ত্র নিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে কুমুর চলেনি। তখন বারবার স্মরণ করতে হয়েছে কালিদাসকে কিম্বা মীরাবাঈকে। নিস্তেজ অন্ধ আত্মদানে এসব বাহানার কোন প্রয়োজনই হয় না। অতএব ভাবতে হয়, কুমুর মনের গভীর তত্ত্বরূপ তাকে চালিত করেনি। বরং কাব্যপ্রেরণায় উজ্জীবিত আধুনিকতা দিয়ে চাওয়া-পাওয়ারই হিসেব করে গেছে সে শেষ পর্যন্ত, উদ্ধৃতিতে যে সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধেরই ইঙ্গিত ছিল।

দাদার শিক্ষা সাহচর্যে কুমু অনেকগুলি ব্যবহারিক গুণ অর্জন করেছিল যার দরুণ পর্দানসীনা রমণীরা নিমেষেই মুক্তির আলো দেখতে পারে। ঐ গুণ ও রুচিশীলতার অধিকার নিয়ে আত্মগর্বও ছিল তার মনে। Cultural superiority নিয়ে তার এই Complex তার স্বামী ও পরিজনবর্গের প্রতি আচরণেও ছায়া বিস্তার করেছে। হয়তো এই superemacy-কেই নুরনগরী চাল বলে ভুল করেছিল মধুসূদন। মধুসূদনের আচরণগত বৈপরীত্যকে তার ক্ষুদ্রতার পরিমাপক হিসেবেই কুমু ভেবেছে, ফলে অসহযোগিতামূলক তাচ্ছিল্যের কবলিত হয়েছে সে। ঘোষালবাড়ীর নিয়মকানুন নিয়ে জা নিস্তারিণীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে [২৬ পরিচ্ছেদে] নববধূ কুমুর মন্তব্য—'স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক?' দাম্পত্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হওয়ার আগেই তার এই বিরূপ মন্তব্যে যে উষ্মা রয়েছে, তার জন্ম ঐ complex থেকেই। একই পরিচ্ছেদে নীলার আংটি নিয়ে তর্কাতর্কির সময় তার অধিকারহীনতার কথা জেনে কুমুর ঝাঁঝালো মন্তব্য—'তবে রইল তোমার এই ঘর পড়ে।' এটাকেও আত্মগর্বেরই বহিঃপ্রকাশ বলতে হবে। কুমুর রুচিগত তাচ্ছিল্যের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ শ্যামাসুন্দরীর প্রতি তার মনোভাবে ধরা পড়ে। নিস্তারিণীর প্রতিবাদহীন ক্রীতদাসীত্বেও কুমুর ক্ষোভ। শুধু এই রমণীর সখ্যতা তাকে ঘিরে ছিল, এই কৃতজ্ঞতায় কোনদিন মোতির মার প্রতি সে রূঢ় হতে পারে নি।

এই মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়াবশেই কুমুর অসম্ভব জেদী স্বভাবের কথা ওঠে। এই জেদ প্রকাশের দুটি হেতু। ১. কুমু বিপ্রদাসেরই ছায়া। দাদাকে সে পিতার অধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। ঋণ জর্জরিত অসুস্থ দাদার জন্য কুমুর কাতরতার কোন শেষ নেই। এই দাদার প্রতি

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপমানে কুমু তৎক্ষণাৎ গর্জে ওঠে। আর মধুসূদনের এটাই ছিল নিত্য বরাদ্দ। বিপ্রদাসের মহিমাকে ছুঁতে না পেরে তার সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে সে উত্তেজনা ও আরাম পায়। তাই স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের একটা কারণ অবশ্যই বিপ্রদাস। ২. অধিকার চেতনা নিয়ে কুমু অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। তার মানবিক অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করলেই এক অনড় জিদ কুমুকে আশ্রয় করে বসে। তখন তার আচরণে কোন মাত্রাজ্ঞান থাকে না। ঘোষালবাড়িতে বউদের গোলামি করাই রেওয়াজ, নিস্তারিণীর কাছে একথা শোনামাত্রই তার মনুষ্যত্ববোধ আহত হয়। তখনই সে গোলামি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাতি-শেজ রাখার ঘরকে তার শয়নকক্ষ বানায় এবং ভাত-কাপড়ের দেনা মেটানোর জন্য শেজ পরিষ্কারের কাজ নেয়। জেদই তাকে আত্মকৃচ্ছ্রতার বিলাসে মাতিয়ে তোলে। এরপর হুকুম করার অমানবিক অভ্যাসকে শাসিত করার জন্য সে বিচিত্র পথ নেয়। এক নম্বর হুকুম সমাধা হলে মালিকের কাছে দুই, তিন পরম্পরার হুকুম প্রার্থনার জন্য বিনীত প্রতীক্ষা করার মধ্যে এক ধরণের ছদ্ম ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পেয়েছে। হুকুমদার মানুষ এতে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়, মধুসূদনও তাই হয়েছে। কুমুর নিরীহ শীতল ঔদাসীন্যের আচরণগুলিকে চূড়ান্ত অবাধ্যতার নিদর্শন মনে করলে অন্যায় হবে না।

কুমুর চরিত্রভূমিকার দুটি স্তর। ১. বধূত্বের পরীক্ষাদানে রত কুমু এবং ২. প্রত্যাখ্যাত ও অবমানিত কুমুর identity সন্ধানের পর্ব। দুই পর্ব পরিস্কার সীমারেখায় বিভক্ত। প্রথম পর্বে পরীক্ষাধীন কুমুর জীবনে দুটি বিচিত্র অস্বাভাবিকতা বা absurdity-র সন্ধান পাওয়া যায়। ক. অধিকার সচেতন দ্বন্দ্বরত কুমু স্বভাব বৈপরীত্যে ভোগে এবং তার জন্য অনুশোচনা করে পরিত্রাণের উদ্ভট উপায় সন্ধান করে নেয়। খ. যৌনাবেগ বিষয়ে অস্বাভাবিক শীতলতার সে শিকার। স্বামী-স্ত্রীর ভাবাত্মক মানসবিরোধের মধ্যেও যৌন সহবাস অনেকটা ফাটল পূরণের কাজ করে। কিন্তু স্বামীর স্বাভাবিক যৌনক্ষুধার সামনে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের মতোই কুমুকে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখা যায়। এটাই অস্বাভাবিকতা। ফুলশয্যের রাত্রে স্বামীর সঙ্গে শয্যা গ্রহণের আগে তার মূর্চ্ছিতা হওয়ার অতিরঞ্জিত ঘটনাটি মানসিক ব্যাধির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। হতে পারে, প্রথম কৈশোরে মা-বাবার তীব্র মনোমালিন্য এবং তারই পরিণামে দুটি আচম্বিত মৃত্যু অন্তর্মুখী স্বভাবের মেয়েটির অবচেতনায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। এরই কারণে মিলনে তার অনীহা এবং যৌনক্ষুধার [অপর পক্ষের] প্রকাশের সামনে কুঁক্‌ড়ে যাওয়া। কুমুদিনীর উপর্যুপরি প্রত্যাখ্যানে তাই মধুসূদনের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক। শুধু এই নারী প্রবৃত্তির অপরিস্ফুটতা থাকলে একরকম হতো। অধিকন্তু কলারুচিসম্পন্না রমণীটি আর এক ভাববিলাসের মধ্যে জড়িয়ে নিজেকে জটিল করে তুলেছে। আগে আত্মদানের প্রস্তুতি, পরে দেহদান হয়তো এটাই কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু বিবাহ নামক যৌন সহবাসের পাশপোর্টের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি এরকম নাও হতে পারে। সরাসরি অব্যবহার্য যৌনক্ষুধার কবলিত হতে পারে নারী-পুরুষ, কোন মানসিক প্রস্তুতি না রেখেই। প্রেমজ বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাকবিবাহ মানস প্রস্তুতিটা সেরে রাখা যায়, কিন্তু বিবাহদায়ের ভাষা যে অন্যরকম। কুমু যৌন সহবাসকে শিল্পমণ্ডিত রূপে দেখতে চায়। এখানে তার বাহানা এইরকম, তার দেহদান যেন প্রণয় অধিদেবতার কাছে নিবেদিত নৈবেদ্যের চরিতার্থতা পায়। স্বামী ব্যক্তিটি সহযোগ প্রত্যাশা করছে আর অদৃশ্য অধিদেবতার নির্দেশ না আশা পর্যন্ত রমণী প্রস্তুত হতে পারছে না, এতো এক অস্বাভাবিক উদ্ভট পরিস্থিতি! মধুসূদনের সঙ্গে বাহ্য আহ্বানে [অন্তরের পূর্ণ নির্দেশ আসেনি] মিলনরাত্রি কাটিয়ে নিবেদিতা নারী যদি আত্মগ্লানিতে ভরে যায় তবে তার দাম্পত্যের ভবিষ্যৎ কী?

প্রথম যাচিত মিলনের [৩৬ পরিচ্ছেদ] পর কুমুর তৃপ্তি এলো না। কারণ গিরিধারীলালের কাছ থেকে সংকেত আসেনি। এই কুমু একান্তে বসে ভাবছে [৩৭ পরিচ্ছেদ] :

- ঠাকুর নারী বলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি; যে শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য? আজ কিছুতেই ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বারবার করে বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো— আজ বিদ্রোহিনীর মন বলছে 'তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে?' কোন লজ্জায় আনব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে গ্রহণ না করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে—যে হাটে, মাছ-মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়....,

এতো গ্লানির ভার যার মনে, যৌনতাকে ক্লেদাক্ত হতে দেখলে যার মন বিবিক্ত হয়, সে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় কাটাবে কি করে! মধুসূদন কি স্বীকার করবে তার ও কুমুর মধ্যে জায়গা জুড়ে থাকা এক অদৃশ্য অস্তিত্বকে। কুমু যখন ঘর করার প্রস্তুতি নিয়েছিল তখন কত সহজ ছিল তার ঘর করার রাস্তা! নৈর্ব্যক্তিক স্বামীকে পূজা করতে পারলেই আর কোন অসুবিধে নেই। আর এখন কিনা গিরিধারীলালের সঙ্গে ব্যবসাদার স্বামীকে মেলানোর চেষ্টা। সুতরাং কুমুর মধ্যে একটা স্ববিরোধিতার জায়গা থাকছেই। স্বামীকে বিমুখ করার জন্য প্রচলিত নারীধর্মের বিচারেই একটা অনুশোচনা ও পাপবোধ কুমুর মধ্যে ক্রিয়া করছে। স্বামীর মর্জিমত চলতে না পারাটা ঠিক কাজ হচ্ছে না স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাসী কুমুর মনে এ চিন্তা উঠছে। আর তখনই দ্বিগুণ উদ্যমে আধ্যাত্মিক মন্ত্রোচ্চারণ থেকে শক্তি সংগ্রহে উদ্‌গ্রীব হচ্ছে কুমু। এখানেই অসঙ্গতি আর অস্বাভাবিকতা!

২. সংসারের সুর ও ছন্দ ধরার জন্য মধুসূদনের নানামুখী চেষ্টা আছে, তা বালখিল্যসুলভ হলেও স্বাভাবিক। আর কুমু যান্ত্রিক ভূমিকা রক্ষা ছাড়া যে চেষ্টা করেছে তা আত্মত্রাণেরই পথ সন্ধান, যৌথ নিবন্ধনের কোন ওষধি তার মধ্যে নেই, তদুপরি সে পন্থা অস্বাভাবিক। আত্মত্রাণের পথ খোঁজার সঙ্গে identity-র দাবিটা নানা অছিলায় কুমু প্রথমাবধি তুলে এসেছে। এই মনোভাবটা পরিস্থিতিগত কারণে তীব্র এবং দৃঢ় হয়েছে কুমুর জীবনভূমিকার উত্তরার্ধে। এই অংশেই ধারাবাহিক অসম্মানের সামাজিক প্রতিবিধান খোঁজা হয়েছে। এই অংশে কুমুর পক্ষে সর্বক্ষণ ওকালতি করতে দেখেছি আমরা বিপ্রদাসকে। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে সংসর্গকে চরম অনৌচিত্য ভেবে সেখান থেকেই কুমুর দৃষ্টান্তে সমগ্র নারীজাতির অসম্মানকে নিষ্কাষণ করতে চেয়েছেন বিপ্রদাস। অথচ তাঁদেরই বংশে-সমাজে পুরুষের দ্বিতীয় নারী আসক্তির আকছার ঘটনা ঘটে থাকে। কুমুও তার নিজের অসম্মানকে বড়ো করে দেখার মধ্যে নারীজাতির শ্রেণীবেদনার আভাস কোনদিন পায়নি। তাই তার দাদার উত্থাপিত যুক্তি প্রসঙ্গে কুমুকেএমন প্রশ্ন করতে দেখা গেছে—'তুমি কোন্ অপমানের কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে।' এমন কী নারীর যন্ত্রণামুক্তির জন্য দাদা লড়াইয়ের কথা বললে বোন তার সারমর্ম বুঝতে না পেরে বলে 'কীসের লড়াই দাদা?' । যে অপমানের সার্বজনীন গভীরতা বোঝে না, এমনকী লড়াইও বোঝে না তাকে কেন্দ্রে রেখে এক অসম্ভব লড়াইয়ের কথা ভাবলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে স্বামী ত্যাগ করেও, সন্তানের কথা ভুলেও নারীর অপমান-ঋণের কোন পরিশোধ হয় না, কুমুব মধ্য দিয়ে এমন জোরালো slogan ও তোলা হয়েছে। তথাপি ভাই-বোনের পারস্পরিক সম-অনুভূতিতে এই লড়াই পর্বটা তেমন জমে ওঠেনি। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে আলোচিত কিছু সূত্রকে তর্ক-বিতর্কে এখানে ঝালিয়ে নেওয়া গেছে, কিন্তু তাতে কুমুর চরিত্র পরিবর্তনের

কোন লক্ষণ ধরা পড়েনি। এই যৌথ লড়াইয়ে কুমুর প্রথম দিককার বোধগত অপরিণতি কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে এলে কুমুকে সক্ষমতার সঙ্গেই নিস্তারিণী-বিপ্রদাস তর্কে অংশ নিতে দেখেছি আমরা। কিন্তু সেখানেও কুমুর উত্থাপিত যুক্তি সামাজিক স্থিতিবস্থার পক্ষে গেছে। সংসারে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে না এটাই কুমুর অভিমত। যুক্তি হিসাবে নারীর স্থিতিবাদী ভূমিকাকে সে সমর্থনও করেছে।

- লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারিনে।

সূত্রপাতের কুমু আর সমাপ্তিলগ্নের কুমু তাহলে একই মেরুতে দণ্ডায়মান। প্রশ্ন জাগে, আঁকড়ানোই যখন তাদের স্বভাব এবং না ছাড়তে পারাটাই ভবিতব্যতা, তাদের ধর্মানুযায়ী হয়েও কুমু কেন অচঞ্চল স্থিতির দৃষ্টান্ত হতে পারে না? তাহলে কি দ্বন্দ্বের মূল কারণটা তার ক্ষেত্রে অন্তর্গত? নিজেরই মনোগত ভাববিলাস এবং উদ্ভট স্বভাবধর্মের জন্যই কী সে নিজেই তার দাম্পত্যকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো?

বিপ্রদাস :

জমিদার বংশের ছেলে রবীন্দ্রনাথের রচনায় জমিদার জীবন তেমন ভাবে ধরা দেয়নি। রাশভারি দোর্দণ্ডপ্রতাপ চরিত্র যেমন তাঁর লেখায় প্রায় অনুপস্থিত, জমিদারি অন্তঃপুরের বেদনাভরা কাহিনী বা জমিদারদের বহিরঙ্গ প্রমোদবিলাসের রসালো কাহিনী তাঁর কলমকে সেভাবে আশ্রয় করেনি। ঠাকুর বংশের চিকনশ্রী তাঁর অঙ্গে থাকলেও অভিজাত সৌখিনতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন মানসিক সম্মোহন ছিল বলেও মনে হয় না। একে আবার পূর্ণ অনীহা বলেও একেবারে দাঁড়ি টানতে পারছি না। কারণ পরপর দুখানি উপন্যাসে জমিদার জীবনের কিছু উপস্থাপনা তিনি ঘটিয়েছেন। ঘরে বাইরের নিখিলেশ এবং যোগাযোগের বিপ্রদাসকে দেখলে বোঝা যায় পরিবার-প্রতিবেশের একটা হাল্‌কা পলিস্তর তাঁর মনের মধ্যে ছিল। নোতুন কালের বন্দনা সূত্রেই ঐ দুই উপন্যাসে contrast হিসাবে জমিদারি জীবন প্রসঙ্গের কথা এসেছে। সন্দীপ এবং মধুসূদন কাল পরিবর্তনের সুর ভাঁজতে গিয়ে যে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল, তাদের আতিশয্য অধীরতাকে চিহ্নিত করার জন্য বিপরীতে স্থৈর্য এবং সাংস্কৃতিক শ্রীর বিকল্প চিত্র আঁকার দরকার ছিল। ফলে এরা প্রায় বিকল্প গরিমার ছবি হিসাবেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আর ছবি আঁকতে গিয়ে অনুষঙ্গ মানসিক সংলগ্নতাকে রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যেতে পারেন নি। নিখিলেশ যুক্তি মানবিকতার ঐশ্বর্য নিয়ে ধরা দিলেও বিপ্রদাসের সঙ্গতিহীন আভিজাত্য নিয়ে কোথায় একটা বিষণ্ণতার ঘনীভবন আছে। অনেকটা ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের প্রতি তারাশংকরীয় টনটনে বিষণ্ণতার মতোই। তারাশংকরের স্পর্শকাতর সংবেদনার ওটাই ছিল প্রধান লক্ষণ, রবীন্দ্রনাথে একটা ঝিলিকের ভগ্নাংশ হয়েই তা ধরা দিয়েছে।

বিপ্রদাসের চরিত্র প্রতিরূপের মধ্যে জমিদার সত্তার যে অংশটুকু আছে তাকেই প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রধানত যত্নবান। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত দরদের অংশ অনেকখানি। বিপ্রদাসের ব্যক্তিগত ভাবমহিমাকে উত্তুঙ্গ করে তুলে এবং তাঁর পড়ন্ত আভিজাত্যের বিষণ্ণ মহিমাকে প্রকট করে তুলে শিল্পীর পূর্ণ পক্ষপাত তাঁকে অর্পণ করেছেন। পিতৃপুরুষের দেদার

সৌখিনতা ও প্রমোদ বিলাসের প্রায়শ্চিত্ত করছেন বিপ্রদাস, ঋণ জর্জর বর্তমানকে সামলানোয় তাঁর অচঞ্চল ভূমিকার মধ্যে এই সামগ্রিক তাৎপর্যের বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বর্তমানের বিকিয়ে যাওয়া সাবেক কালের চেক বলে আখ্যাত করেছেন তার মধ্যে তাঁর দরদী মনোভাবের পরিচয় রয়েছে। ভাই সুবোধের স্বার্থপর ভূমিকা, বোন কুমুর বৈবাহিক সিদ্ধান্তের চপলতা এবং ভগ্নীপতি মধুসূদনের মাত্রাধিক রূঢ়তা যখনই তাঁকে বিব্রত করেছে তখনই শিল্পী চরিত্রটিকে এক বিষণ্ণ বেদনার ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের অন্তে অসুস্থ বিপ্রদাসের নিঃসঙ্গতা যখন বেদনায় জারিত হয়, পাঠক তার ভাবসংস্পর্শকে কিছুতেই এড়াতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ কালদ্বন্দ্বের খতিয়ানে বিপ্রদাসের অভিজাত ভাবমহিমাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই তাঁর বেনিয়া ভগ্নীপতির রূঢ়তা ও দৌরাত্ম্যকে contrast-এ রেখেছেন। মধুসূদনের উপর্যুপরি উদ্ধত অমানবিক আচরণের শক্তিশেল গুলিকে অপরিসীম ধৈর্যশীলতায় বিপ্রদাস যেভাবে বুক পেতে অবলীলাক্রমে বরণ করেছেন তা উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক শিক্ষা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সৌজন্যবোধ, বিবেচনা বুদ্ধি, মানবিক হৃদয়বত্তা ইত্যাদি মূল্যবোধে বিপ্রদাসের অবস্থান মধুসূদনের চেয়ে অনেক অনেক উচ্চে। এই ভাবগরিমার একটি সুন্দর পরিমাপ রবীন্দ্রনাথ নিস্তারিণীকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। আগত নববধূ কুমুদিনীর প্রতি নিজের সঙ্গ-মুগ্ধতার কারণ খুঁজতে গিয়ে নিস্তারিণী ভাবছে :

- এই ভালোবাসার পূর্ব-ভূমিকা হয়েছিল ষ্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। মোতির মার মনে হয়েছিল কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওঁর পা দুটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজও সে ভুলতে পারেনি।

পৌরানিক মূল্যমানের দর্পণে বিপ্রদাসকে এই দেখা অযথার্থ ছিল না। অন্তত তিনটি চরিত্র বৈশিষ্ট্য ভীষ্মের সঙ্গে মেলে—অকৃতদারত্ব, অচঞ্চল অভিভাবকত্ব এবং পরিণামী নিঃসঙ্গতা। মধুসূদনের কাছে অনতিক্রমণীয় নুরনগরী চালের ব্যাখ্যাটি এখানে আমরা সহজেই পেয়ে যাই। নুরনগরী চাল যে শুধুমাত্র একটা ঠাট বা পদ্ধতি প্রকরণ নয়, অভিজাত সংস্কৃতির এক গুণান্বিত যোগফল একথা বিপ্রদাসের দিকে মুখ ফেরালেই আমরা জানতে পারি।

আভিজাত্য যে ঐতিহ্যবাহিতার এক পরিণামী সত্য একথা বিশদভাবে বোঝানোর জন্যই বিপ্রদাসকে শিল্পী অতীত কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মুকুন্দলাল-নন্দরাণীর গভীর মনোমালিন্যের একটি ঘটনা ভাই-বোন দুজনের মনেই দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে গিয়েছে। নন্দরানীর চিরতরে গৃহত্যাগের জন্য বাবা মুকুন্দলালের অবমাননাকর আচরণই দায়ী, এই হলো বিপ্রদাসের ব্যাখ্যা। কুমু কিন্তু ঠিক বিপরীত বিচারের পক্ষপাতী। মার জেদ ও অসহিষ্ণুতা যে মুকুন্দলালকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হিসাবে মৃত্যু উপহার দিয়েছিল, একথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। বাবার শেষ আক্ষেপোক্তি—'বড়ো বউ ঘরে কি আলো জ্বালবে না?' আজও কুমুর অন্তরকে পোড়ায়। কিন্তু তফাত এই, বাবার অবমাননার বিরুদ্ধে সেই বয়সে দাঁড়াতে না পারা বিপ্রদাস আজ কুমুর জীবনে একই ছায়া বিস্তারকে প্রতিরোধ করার জন্য মধুসূদনের আচরণের বিপক্ষে দাঁড়ান, আর কুমু বাবার শেলবিদ্ধ কাতরোক্তি মনের মধ্যে পুষে রেখেও বিপরীতধর্মী স্বামীর সঙ্গে সামঞ্জস্যের কথা ভাবতেও পারে না।

বিপ্রদাস

উপন্যাসের মধ্যে বিপ্রদাসকে পাওয়া যায় উত্তরাধিকারের ঋণের বোঝা সামাল দেওয়ার অবস্থার মধ্যে।

- বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখলে, যে গাছে তাদের আশ্রয় তার শিকড় খেয়ে গেছে পোকায়। বিষয়সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে—অল্প করে ডুবছে।

এই নিমজ্জমান জমিদারিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে উপস্থিত বুদ্ধিতে যা যা করণীয় বিপ্রদাস তাই করেছেন। দেশের বাড়িতে জমিদার জীবনের ইতি-কর্তব্য সারার সমস্ত দায় ঘাড়ে চাপবে, তাই প্রথমেই ডেরা বদল করেছেন। গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন পুরানো কলকাতার প্রাণ কেন্দ্র বাগবাজার অঞ্চলে। এখান থেকেই তাঁর একক লড়াই-এর সূচনা। প্রবাসী ভাই আত্মদোহনে ওস্তাদ, তাই তার কাছ থেকে ব্যথা পাওয়া যায়, কোন সহযোগের প্রতিশ্রুতি আসে না। বোন কুমুকে সমস্ত আঁচের বাইরে রাখার পর তার কাছে প্রত্যাশার আর কিছুই থাকতে পারে না। তবু তার অকৃত্রিম ভক্তি ও হৃদয়বত্তার বেড়ের মধ্যে তিনি আছেন এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পাওনা। নিঃস্বার্থভাবে সবাইকে পরিষেবা দিতে গিয়ে বিপ্রদাস যে দায়িত্ব পরায়ণতা ও কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাই তাঁর চরিত্রের সদ্‌গুণ।

পোকায় খাওয়া শেকড়ের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসার পরই বিপ্রদাস আদরের বোন কুমুর চরিত্র গঠনের দিকে সর্বাধিক মন দিয়েছেন। বাবা-মার জীবনধারা দেখে ঐ ধারাপ্রবাহে কুমু পরবর্তী জীবনে যাতে বন্দী না হয়ে পড়ে এ বিষয়ে ছিল তাঁর সতর্ক নজর। এজন্য কুমুর মনোগঠনে ও ব্যবহারিকতায় আধুনিক হওয়া প্রয়োজন। কুমু যে পর্দানসীন নারীত্বের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এলো, তার জন্যে বিপ্রদাসের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রধান। ঘোড়ায় চড়া, পিস্তল চালানো, ফটোগ্রাফ তোলা, দাবাখেলা, কালিদাসের কাব্য-নাটকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এই শিক্ষার সিলেবাস ধরে কুমু জীবনান্তরে পৌঁছালো। বিপ্রদাসের এই শিক্ষাদান পর্ব যেমন তাঁর অভ্রান্ত গুরুগিরির প্রমাণ দেয়, তেমনি তাঁর অচরিতার্থ একাকীত্বে সঙ্গ-সুধার বান নিয়ে আসে। ভাই-বোনের এই আত্মীয়তার জগৎ আশ্চর্য মধুরতায় ভরা। ছোট বোন কুমু বিপ্রদাসের হাতে গড়া শিষ্যা, তার সখ্যতা ও ভক্তিপরবশ্যতার মধ্য দিয়ে বিপ্রদাসের বাঁচার একজাতীয় অর্থবহতা তৈরি হয়। শুধু বিপ্রদাসের খেদ এই, তাঁর সর্বগুণান্বিতা শিষ্যাকে উপযুক্ত জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গেঁথে দিয়ে তার পূর্ণ জীবনদ্যুতিকে তিনি চোখ ভরে দেখে যেতে পারলেন না। কুমুরই আবেগ আতিশয্যে এক অযোগ্য পাত্রে তাঁর আদরের বোনটিকে সমর্পণ করতে তিনি বাধ্য হলেন। বোনের দগ্ধ দাম্পত্যের জন্য ব্যথার বোঝা বহন করতে তাঁকে বেঁচেও থাকতে হলো। এই দাম্পত্যের বিসদৃশতাকে বিপ্রদাস তাঁর জ্ঞানচক্ষু দিয়ে আন্দাজও করতে পেরেছিলেন। তাই নবদম্পতির বিদায় দৃশ্যের ছবিটি এই ভাবে তাঁর কাছে আঁকা হয়ে গিয়েছিল :

- পরস্পরে আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল।

প্রিয়তম বোনের দাম্পত্য-দুর্গতির জন্য বিপ্রদাসের অপরাধবোধও কিছু কম গভীর নয়। অথচ এই বিবাহের অনুঘটক তিনি নন। কুমুর যাচিত বিবাহের দুর্ভাগ্য সেই বহন করুক, এমন আত্মস্বার্থপর চিন্তার মানুষ তিনি আদপেই নন। বিবেচক হৃদয়বান বিপ্রদাস কুমুর বিপর্যস্ত দাম্পত্যের সমব্যথী হয়ে একটি দামী কথা বলেছিলেন।

- আমি তোকে ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারিনি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুরবাড়ীর জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।

বিপ্রদাসের উপলব্ধি যথার্থ। মেয়েদের জীবন সংসার ও সমাজকে মানিয়ে চলারই জীবন: তার স্বাতন্ত্রিকতার শিক্ষা সংসারকে ছাপিয়ে উঠতে চাইলেই সংসার রক্ষার কাজ কঠিন হয়। কুমুর শিক্ষা ছিল কেন্দ্রাতিগ। সুতরাং সংসারমুখী শিক্ষা দিতে না পারার দায় তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিপ্রদাস অকৃতদার। এটা না বিবাহের কোন সিদ্ধান্ত নয়। একদিন প্রথামতে তাঁরও বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে বিবাহ তাঁর জীবনে আকার পায়নি।

- পিতা বর্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ প্রায় ঠিক, এমন সময় গায়ে-হলুদের দুদিন আগেই কনেটি জ্বরবিকারে মারা গেল। তখন ভাটপাড়ায় বিপ্রদাসের কুষ্ঠি গণনায় বেরোল, বিবাহস্থানীয় দুর্গ্রহের ভোগক্ষয় হতে দেরি আছে। বিবাহ চাপা পড়ল। ইতিমধ্যে ঘটল পিতার মৃত্যু।

একেই বলে ভাগ্যের মার। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারির জোয়াল চেপে বসলো ঘাড়ে। বিপ্রদাস আর পিঁড়িতে বসার সময় পেলেন না। বেদনার আর এক অঙ্ক যুক্ত হলো বিপ্রদাসের জীবনে। শিল্পীর হিসাব মতে, এই অকৃতদারত্বই বিপ্রদাসকে সকলের ভার বহনের সামর্থ জুগিয়েছে। আবার অন্তিমে প্রকটিত তাঁর বিধুর নিঃসঙ্গতার সঙ্গেও এর যোগ সুনিবিড়।

বিপ্রদাস রুচিশীল, ব্যালান্সড এবং তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদার অধিকারী। এগুলোর অনেকটাই তাঁর রক্ত-সংস্কৃতির দান। অমানবিক আচরণে ও অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে বিপ্রদাস মনের গভীর অংশ থেকেই ঘৃণা করেন। মধুসূদনের বিবাহকালীন দৌরাত্ম্যকে তিনি যে সহ্য করে গিয়েছিলেন, এর মধ্যে তাঁর মানসিক দুর্বলতার পরিচয় নেই। নুরনগরে ফিরে এসে ঐশ্বর্যমদে স্ফীতগর্বী মধুসূদন যখন ঢাক পিটিয়ে নিজেকে জাহির করে বেড়াচ্ছে, তখন বিব্রত শরিকরা বংশগতির সম্মান রক্ষায় উদ্যত হলে বিপ্রদাসের পরামর্শ ছিল এই :

- নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা—ওটা ইতরের কাজ।

রুচি বা মূল্যবোধ না থাকলে এরকম ভাবনা আসে না, একথা বলাই বাহুল্য। বিপ্রদাসের ভাবনা কতটা ব্যালান্সড তারও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাড়ী সংস্কার করে মধুসূদন নুরনগরের মানুষকে হকচকিয়ে দিলে বাক্‌দত্তা কুমুর মনে ধন্দের সূত্রপাত হয়। বিপ্রদাস তখন নিরপেক্ষ মূল্যায়নে দাঁড়িয়ে বোনকে বলেন :

- ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস। পূর্বপুরুষের জন্মস্থানে আসছে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটাকে স্বতন্ত্র করে দেখিস।

বিপ্রদাসের মর্যাদাবোধ তীক্ষ্ণ। কিন্তু সহজ স্পর্শকাতরতায় সর্বত্র প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন তাঁর স্বভাব বিরোধী। তাই প্রকাশ্য ক্রোধকে তিনি সংযত করতে জানেন, এতে তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাবে অভিমানের বেদনভার প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। পাত্রপক্ষের সঙ্গে বিরোধ চরম পাকিয়ে ওঠার মুহূর্তেই তিনি চুপিসাড়ে তাদের প্রত্যুদগমনে গিয়েছিলেন। পাছে আত্মীয় পরিজনেরা বাধা দেয়, তাই সৌজন্যবোধের তাড়নায় তিনি গোপনে চলে গিয়েছিলেন। অভ্যাগতদের জন্য ঘাটে বজরা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মধুসূদন রূঢ় প্রত্যাখ্যানে সেদিন তাঁর সম্বর্ধনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। মর্যাদাবোধের আঘাতে বিপর্যস্ত বিপ্রদাস একা নিঃশব্দে সে ভার বহন করতে গিয়ে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। উপন্যাসের শেষ পর্বে কুমুকে নিতে এসে তাঁর ভগিনীপতি বাড়ী বয়ে এসেই ভাই-বোনকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে যায়। কুমুকে পুলিশ ডেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুঙ্কার দেয় এবং তাঁকে দেনার দায়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে বলে ভীতি

প্রদর্শন করে। স্বভাব সংযত বিপ্রদাস সেদিন বিচলিত হলেও সংযম হারাননি। অথচ তাঁর ক্রোধ ও বেদনাহত ভঙ্গিটি ফোটাতেও ভোলেননি শিল্পী।

- দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ, পাণ্ডুরবর্ণ মুখ, বড়ো বড়ো চোখ দুটো জ্বালাময়, একটা মোটা চাদর গা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে. কুমুকে ডেকে বললে, "আয় কুমু, আয় আমার ঘরে।"

সংক্ষিপ্ত বাক্যও নির্গলিত লাভার মতো অনেক সময় বেশি তেজিয়ান হয়, সব সময় অতিরিক্ত সংযমহারা বাক্য ব্যয়ে সে কাজ হয় না। মধুসূদন বিপ্রদাসের এই রাশভারি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তাই নিজে নিচে নেমে গিয়ে তাঁকে আঘাত করে আনন্দ পায়। এই তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধের কারণেই বিপ্রদাস এক দিনের তরেও কুমুর স্বামীগৃহে পদার্পণ করেননি। প্রথমত, একথা তিনি বিশদ করেই জানেন, আত্মসম্মান রক্ষা মানুষের নিজেরই দায়। অপরপক্ষ কাণ্ডজ্ঞানহীন অসংযমী হলে তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। দ্বিতীয়ত তাঁকে নিয়ে সদাই বিব্রত স্নেহশীলা বোনটির ঘাড়ে নতুন করে সংঘাতজনিত বিপত্তির বোঝা আর বাড়াতে চান না তিনি।

বিপ্রদাসের মধ্যে নিঃসঙ্গ এক অন্তর্জীবনকে ভাবমহিমা দান করা শিল্পীর লক্ষ্য। তাই সারা উপন্যাসে হয় শারীরিক অবসন্নতা নতুবা প্রত্যাঘাত জনিত অভিমান ও আত্মগ্লানিতে এই আত্মমুখী মানুষটিকে ভারাক্রান্ত দশায় দেখা গেছে। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি বিপ্রদাস আমাদের সংবেদনায় গৃহীত হোক, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা।

কিন্তু বিপ্রদাস শুধুই এক গ্রাহক মনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুন, তাঁর আদ্যন্ত চরিত্র ভূমিকা এক passive reaction-এর চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি হোক, শিল্পী এমনটাই বা শেষ অবধি চাইবেন কি করে! তাই কুমুর চলমান জীবনে অযথা নাক না গলিয়ে তার স্তব্ধ স্থিতাবস্থার মধ্য থেকে নারী নিগ্রহের অর্থ বার করে বিপ্রদাস এক উজ্জীবিত কর্মব্রতে নিজেকে হঠাৎ উদ্দীপিত করে তুললেন। বিপ্রদাসের এতোটা সক্রিয়তার ভাব তাঁর ভূমিকার প্রথম দশায় আমরা পাইনি। কুমু সংসার ত্যাগ করে এসে তাঁর কাছে আশ্রয় পাওয়ার পর থেকে রোগজীর্ণ বিপ্রদাসের জীবনে আবেগদীপ্তির প্রকাশ ঘটেছে। মায়ের অবমাননা নিয়ে মনোক্ষোভের উপর কুমুর অমর্যাদার অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে উদ্দীপ্ত করে তুললো বিপ্রদাসকে। অবুঝ বোনকে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে প্রস্তুত করার জন্য মনোদীক্ষা দেওয়া, সাবেক স্থিতিবাদীদের [এখানে নবীন-নিস্তারিণী] সঙ্গে সমাজ ভূমিকা নিয়ে জোরালো তর্ক-বিতর্ক চালানো, জমিদার নন্দনকে এরকম কোন উজ্জীবিত সামাজিক ভূমিকা গ্রহণ করতে আমরা পূর্বে দেখিনি। এযেন বিপ্রদাসের চরিত্র ভূমিকার অজানিত দ্বিতীয় অধ্যায়। এই স্তরেও তাঁর স্বভাবধর্ম স্ফুটনের আর একটি লক্ষণ দেখা যায়। অন্তর্মুখী চরিত্রের মানুষ আত্মপছন্দের কোন নিভৃত কাজে ব্যাপৃত হলে এই কর্মভূমিকাকে ঘিরে তার আবেগময় পরিক্রমণ চলতেই থাকে। তখন আত্মজাগৃতির আলোকেই তার পথ দেখার কাজ শুরু হয়। অপ্রস্তুত কুমুই তাঁর লড়াই-এর আসল ঘোড়া। যাবতীয় অসম্মানের পুঞ্জীভূত বেদনা তারই কাছে গচ্ছিত হয়ে আছে। তিনি তার ভাষ্যকার মাত্র। কিন্তু আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুই খবর রাখে না অপমানের মাত্রা কত গভীরে, লড়াই-এর লক্ষ্য কে এবং কী তার স্লোগান। এমন সহযোগেই হঠাৎ সমস্ত নারীজাতির অপমানের প্রতিকারে তিনি আমরণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে ফেললেন! এর মধ্যে তাঁর লক্ষ্য বা প্রত্যাশার কোন গরমিল নেই, কিন্তু অপ্রস্তুতির আবেগসর্বস্বতা তো রয়েছেই। রবীন্দ্রনাথ এই লড়াইকে যথোচিত রূপ

দেওয়ার জন্য মোতির মাকে ডেকে এনে বিপ্রদাসের সঙ্গে সমাজতত্ত্বগত তর্কে বসিয়ে দিলেন। এতে সমাজ চিন্তার উৎসমুখ খুলে গেল বিপ্রদাসের কাছে, যে সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব কোন মানস প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু লড়াইয়ের রূপরেখাটি ঠিক জমলো না। কুমু স্থিতিবাদী ধারার পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অলক্ষ্যে নিস্তারিণীর পক্ষ নিয়ে ফেলেছে। এটাও বিপ্রদাস যুক্তিমত লক্ষ করেননি। যাই হোক, কুমুর সন্তান সম্ভাবনার প্রশ্নে লড়াই স্থগিত রাখার প্রশ্নটি জোরালো হয়ে ওঠায় বিপ্রদাস একটা বড়ো অস্বস্তি থেকে রেহাই পেলেন। নতুবা এই নবীন সংগ্রামীকে বড়ো ঝামেলায় পড়তে আমরা অচিরেই দেখতে পেতাম। অতএব বলতে হয়, বিপ্রদাসের লড়াই শুরুর ভাবনাটা অযৌক্তিক ছিল না। তাঁর অবরুদ্ধ মনোভাব নামিয়ে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বংশগতিযুক্ত কালান্তর ভাবনার শরিক বলে ধাত্রীদেবতার শিবনাথের সঙ্গে আমরা কিছুতেই গুলিয়ে ফেলবো না।

নিস্তারিণী :

উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলির পাশে মাঝারি ও ছোটমাপের চরিত্রগুলিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এদের প্রত্যেকের জন্য ভূমিকা নির্দিষ্ট করে রাখেন শিল্পী। যোগাযোগে তিন প্রধানের [বিপ্রদাস-কুমু-মধুসূদন] পাশে বিচরণকারী অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে নিস্তারিণীই প্রধান। তার ভূমিকা যেমন বহুমুখী, তার বিচরণও তেমনি অনেকখানি পরিসর জুড়ে। অন্যের পরিপোষকতা না করে নিজের নিটোল সংসারে দীপ্তিময়ী হলে তার স্থাপনা হতো প্রধান চরিত্রেরই পাশে। যদিও উপন্যাসের উত্তর পর্বে তার তার্কিক ভূমিকার গুরুত্ব প্রধান গোত্রীয়তার মতোই।

নিস্তারিণীর বহুমুখী ভূমিকাগুলিকে আগে চিহ্নিত করে পরে তার চরিত্রপ্রকৃতি বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। ক. নিস্তারিণী র নিজস্ব ভূমিকার স্বভাব-দ্বন্দ্বটি সুন্দর। নবীন-হাবলুর কাছে যোগ্য স্ত্রী ও স্নেহময়ী মাতা হওয়া তার প্রধান দায়.। দ্বিতীয় দায় হলো, ঘোষাল পরিবারের অন্তঃপুর-গৃহস্থালির অর্পিত দায়িত্বকে যথাযথ গুরুত্বে পালন করা। খ. এর পরই আসে পরার্থে ভূমিকা গ্রহণের কথা, যেখানে প্রতি চরিত্রের সামাজিক মূল্যের যাচাই হয়। বিপ্রদাস-কুমুর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত মুগ্ধতা নিয়ে নিস্তারিণী প্রথমাবধি বিশেষ স্নেহশীলতা প্রকাশ করেছে সদ্য আগত বড়ো জার প্রতি, এরপর কুমুর দ্বন্দ্ব-দগ্ধতাকে সর্বক্ষণ সখ্য-সুধায় ভরিয়ে রেখেছে নিস্তারিণী। গ. একদিকে পরিবারের ধরন-ধারণ এবং ভাসুরের ধাতুপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে কুমুকে ওয়াকিবহাল করেছে সে, অন্যদিকে সংসার আশ্রম বিষয়ে কুমুর মন্ত্রণাদাতা হয়ে তার দ্বন্দ্ব নিরসনে সাহায্য করেছে। তার এই ভূমিকা গ্রহণের জোরেই কুমু দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রে বহুক্ষণ টিঁকে ছিল, নচেৎ বহুপূর্বেই তার প্রস্থান বা পশ্চাদপসারণ ঘটতো। ঘ. কুমুর মনের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ হলো দাদার প্রতি তার অপরিসীম ভক্তি। বুদ্ধিমতী নিস্তারিণী তা অনুভব করেছে এবং দাদার কাছ থেকে সংযোগ ছিন্ন কুমুর জীবনে ঝুঁকি নিয়ে সেই সম্পর্কের সূত্র জোড়ার কাজে স্বেচ্ছাব্রতী হয়েছে। ঙ. স্বামী সোহাগিনী নিস্তারিণী নবীনের সাহস ও আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তুলে দাম্পত্যে প্রেরণাদাত্রী স্ত্রীর ভূমিকা পালন করেছে। চ. এই অশিক্ষিতা নারীর ঘাড়ে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বোঝা চাপিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কুমুর আচরণ দৃষ্টান্তকে ধরে সাবেক নারীব্রতের সঙ্গে আধুনিক স্বাতন্ত্রিকতাবোধের একটা তাত্ত্বিক লড়াই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের উত্তরভাগে গড়ে তুলেছেন। কুমুর মন্ত্রণাদাতা হিসাবে ৪৪ সংখ্যক

পরিচ্ছেদে নিস্তারিণীর এই ভূমিকার সূত্রপাত হয়েছে এবং উপন্যাসের উত্তরভাগে বিপ্রদাসের সঙ্গে নারী স্বাধীনতা বিষয়ক বিতর্কে তা আরো স্পষ্টতর হয়েছে।

উল্লিখিত ভূমিকাগুলি বিশ্লেষণ সূত্রেই নিস্তারিণীর চারিত্রিক গুণাবলীর হদিশ পাওয়া যেতে পারে। ১৯ সংখ্যক অধ্যায়ে কুমুর সঙ্গে প্রথম আলাপ সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ মোতির মার চেহারার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

- একটি মোটামোটা কালো কালো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব, কুমুর সমবয়সী হবে, ওর কাছে এসে বসল।

সংসারে পোক্ত গৃহিনীর বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। কিন্তু চোখে-মুখে উপছানো স্নেহের ভাব। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ সখ্যরসের বন্ধন তৈরি করবেন দুই জায়ের মধ্যে। একই দৃশ্যে মোতির মার বিপ্রদাস বন্দনা রয়েছে। কুমুর বিমর্ষ মনোভাবের হদিশ খুঁজে নিয়ে তার মনের ভার নামানোর জন্য বিপ্রদাস-স্তুতির দাওয়াই প্রয়োগ করলো নিস্তারিণী।

- আহা কী সুপুরুষ। এমন কখনো চক্ষে দেখিনি। ঐ যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে :

  গোরার রূপে লাগলো রসের বান—
  ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর বাণ

  আমার তাই মনে পড়ল।

প্রথম প্রস্তাবেই বোঝা গেল, এই রমণী বুদ্ধিমত্তা ও অনুভবী হৃদয়বেত্তার অধিকারী এবং সুরসিকা। কুমুর সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক এখান থেকেই পাকা হয়ে গেল। নিস্তারিণীর সুগৃহিণীপনা ও সাংসারিক দায়িত্ববোধের বিবরণ নানাভাবে সমগ্র উপন্যাসে ছড়ানো রয়েছে। অতিবড় প্রভুত্বকামী ও ভীতিসঞ্চারক মধুসূদনও তার সংসার নিপুণতার মস্ত বড়ো স্তাবক। মূলত মধুসূদনের হুকুম মতোই ঘোষাল বাড়ীর অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ও নিয়মশৃঙ্খলা নিস্তারিণীর হাতেরই দান। তার যত্ন পরিষেবা যে সর্বত্র সজাগ তা শ্যামাসুন্দরীর স্বীকারোক্তি থেকেই পাওয়া যায়।

- মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, বেড়ে রাখবে তোমাকে—যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্ছি, ওর বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব।

নববধূর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ, dramatic irony-র নিদর্শন।

নবীন সপরিবারে মধুসূদনের আশ্রয়পুষ্ট। দাদার ব্যবসায় খিদমতগিরি তার কাজ, আর অন্তঃপুর সামলানোর দায় নিস্তারিণীর। খাওয়া-পরা ভরণ-পোষণের মূল্যে একাজ করতে হয় বলেই স্বামী-স্ত্রী গৃহপ্রভুর মেজাজ-মর্জি সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। বুদ্ধিমতি নিস্তারিণীর ভাসুর সংক্রান্ত মূল্যায়ন অত্যন্ত স্পষ্ট। আত্মসংরক্ষণের দায়ে এ কথা তাকে বিশেষভাবে বুঝতে হয়েছে। তাই মধুসূদন মেজো-বউয়ের কর্তৃত্বপরায়ণতায় বিরক্ত হয়ে বারবার রজবপুরে তাদের চালান করার ভয় দেখালেও নিস্তারিণী নির্ভয়। তার নির্ভয়তার যুক্তিতে হয়তো নতুবার কোন অনুমান নেই, আছে নির্ভুল অঙ্ক কষা। স্বামীকে প্রবোধ দান করে সে বলছে :

- ভয় পাও বলেই ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয়নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সা লোকসান হয় সে-ঠেকা ওঁর সইবে না।

ভাসুরকে হাড়ে-গোড়ে জানে বলেই মিতাকে [কুমু] আগাম জানিয়ে রেখে নিস্তারিণী

তার সাহায্যই করতে চেয়েছিল। মধুসূদন এবং ঘোষালবাড়ির ঘরানা সম্বন্ধে জ্ঞাত করানোকে তার সখ্যতার মূল্য হিসাবেই দেখা উচিত।

ভাসুরের স্বভাব বিষয়ে :

- ও মানুষকে এখনো চেননি। ওযে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হয়ে এক মাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিল, তার পরের দুই-তিন মাস খাইখরচ পর্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে। এতদিন আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আসছি সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ। আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না। এ বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর-চাকরাণী পর্যন্ত সবাই গোলাম।

নারীর স্বতন্ত্রিকতা ঘোষাল বাড়িতে মূল্যহীন এ বিষয়ে :

- 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?' 'না, রইল না। যা-কিছু রইল তা স্বামীর মর্জির উপরে। জাননা, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে?

দাদার সংযোগসূত্র ছিন্ন কুমুর অবরুদ্ধ সংসারজীবনে নিস্তারিণীই ছিল একমাত্র ওয়েসিস। স্বামীর কাছ থেকে আঘাত প্রাপ্ত কুমুর প্রতিটি ক্ষতে পরম মমতায় সে শুশ্রূষা করেছে। নিস্তারিণী পাশে না থাকলে কুমুর পক্ষে প্রতিটি গ্লানিভার কাটিয়ে ওঠা কিছুতেই সম্ভব হতো না। সমব্যথী সখ্যতায় সে কুমুর বয়সোচিত স্বাতন্ত্রিক ক্রিয়াগুলি অনুধাবন করে এবং তার দুঃখভারের অংশ নেয়। প্রয়োজনে নিজের সঙ্গে কুমুর দশার পার্থক্যও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খুঁজে বার করে। তার আত্মোক্তির মধ্যে অনুভবী চিন্তা ও বিচারশক্তির হদিশ পাওয়া যায়।

- ও ভাবতে লাগল, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকি ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। ছোটো ছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ্ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে, কোথাও কিছু বাধেনি।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন। সংসার গতির ধারাবাহিকতা নিয়ে একটা study রবীন্দ্রনাথ নিস্তারিণীকে দিয়ে করিয়েছেন। এই চিন্তাসূত্রের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী অনুচিন্তাকে মেলালে হিন্দু বিবাহ বিষয়ে একটা চিন্তনের দ্বার আমাদের কাছে খুলে যায়। কুমু প্রসঙ্গে নিস্তারিণীর সংবেদনশীল সহমর্মিতার আরও একটা দিক রয়েছে। বিপ্রদাসের ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে আকুলতার যন্ত্রণা ভোগ করছে কুমু, এরই প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে নিস্তারিণী ভাই-বোনের সংযোগ গ্রন্থি রচনায় যত্নের সঙ্গে উদ্যোগ নিয়েছে। নবীনকে দিয়ে টেলিগ্রাম করানো বা বিপ্রদাসের পত্র আসার সংবাদ সংগ্রহ করানোয় কুমুর অসহায় যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হয়েছে। গৃহকর্তার হুকুমী শাসনের ভ্রূকুটি তাচ্ছিল্য করে সাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্যে নিস্তারিণীর হৃদয় উৎসকে আমরা আরো গভীরতর ভাবে চিনতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ কুমুর ছন্দহীন দাম্পত্যের পাশেই ৪০ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নিস্তারিণী-নবীনের দাম্পত্য রঙ্গের একটা contrast ছবি এঁকেছেন। বই এবং আলমারির চাবি চুরি করা [রঙ্গচ্ছলে] নিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ এবং কুমুর মধ্যস্থতায় তার মীমাংসাই সাধারণ ছবিটির মধ্যে উচ্ছল প্রেমের অনুসন্ধান থেকেই আমরা জানতে পারি নিস্তারিণীর স্ত্রী ও গৃহিণী জীবনের প্রকৃত

শক্তির উৎসটি কোথায়। স্বামীর পূর্ণ আস্থা অর্জনই তার একমাত্র প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদের।

- মেজো বউয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন-কি, নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য বলেই মনে করে। সেই জন্যেই তার জন্যে কোনো একটা দুরূহ কাজ করবার উপলক্ষ জুটলে যতই ভয় করুক, সেই সঙ্গে খুশিও হয়।

এমন কৃতার্থ জীবনে শুধু অবগাহনেই মগ্ন ছিল না নিস্তারিণী, স্বামীর জীবনে সেও প্রেরণা স্বরূপিনী হয়ে উঠেছিল। দাদার আশ্রয়ে ভীতিমাত্রকে সম্বল করে নবীনের কণ্টকিত তাচ্ছিল্যময় জীবনযাপনে সায় ছিল না নিস্তারিণীর। সরল স্বামীকে প্রবুদ্ধ করতে হলে তাকে আত্মনির্ভর ও সাহসী করে তোলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই কুমুর চিঠির সন্ধানে তাকে লাগিয়ে এবং দাদার বিনা অনুমতিতে বিপ্রদাসকে টেলিগ্রাম করতে বলে মধুসূদনের ভীতি অতিক্রম করার পরীক্ষায় সে নামিয়েছিল নবীনকে। এর ফল মিলেছিল হাতে হাতেই। সাহসী নবীনকে এরপর একাধিক-বার মধুসূদনকে প্রতারণা করার কাজে নিয়োজিত অবস্থায় আমরা দেখতে পাই।

প্রেরণা স্বরূপিনী নিস্তারিণী কুমুর দগ্ধ দাম্পত্যেও অনিবার্য অর্থবহ হয়ে ওঠে। স্বামীর কাছে কুমুর গ্রহণযোগ্যতা গড়ে না ওঠায় চিন্তান্বিত নিস্তারিণী একাধিকবার তাদের দাম্পত্যের তল সন্ধানে অভিনিবিষ্ট হয়েছে। আর এখানেই তার ভূমিকায় অন্যমাত্রা যোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কিছু গুহ্য দিক আছে যা প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা সূত্রে অভিজ্ঞ গৃহিণীরা সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারেন। যোগ্য সখির মতোই নিস্তারিণী কুমুকে তার ভালোবাসা সম্বন্ধে চুলচেরা প্রশ্ন করেছে, জেনে নিয়েছে তার গূঢ় অসুবিধার দিকগুলি। পরে চিকিৎসা বাতলাতে গিয়ে উচ্চারণ করেছে কয়েকটি দীর্ঘ পরীক্ষিত ব্যবহারসূত্র। মিলনতত্ত্ব সম্বন্ধে নিস্তারিণীর পরামর্শ অভিজ্ঞতায় সবিশেষ সমৃদ্ধ। যোগাযোগ উপন্যাসের ৪৪ সংখ্যক পরিচ্ছেদ এই বিষয়ক মতামতে পূর্ণ। কুমুর সাংসারিক নিয়ম পালনের বিঘ্ন আসছে এক সামাজিক কার্যকারণ থেকে। এ বিষয়ে নিস্তারিণীর মত হলো :

- দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্য শাস্ত্র লেখা হয়নি।

দ্বন্দ্ব নিরসনে সাংসারিক সমঝোতার একটা মন্ত্র মেয়েরা জপ করতে পারেই বলে নিস্তারিণীর ধারণা।

- ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কী করে?

সুতরাং ভালোবাসা দিতে না পারার জন্য কুমুর নিজেকে অযোগ্য অপরাধী ভাবার কোন মানে নেই। কিন্তু তাই বলে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারিক সম্পর্ক গড়ার প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে কেন?

নিস্তারিণীর এই মননধারারই আর এক উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা গেছে বিপ্রদাসের সঙ্গে সমকক্ষ তর্ক যুদ্ধের সময়। নারীর অসম্মান নিয়ে বিপ্রদাসের লড়াইয়ের আয়োজনে কুমুকে পূর্ব অবস্থানে ফিরতে না দেওয়ার জিদটা ঠিক নয়, এমন কি কুমুর সংসার ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেও অনড় জিদ কাজ করছে, নিস্তারিণী এ প্রসঙ্গে তার ক্ষুণ্ণতাকে একেবারেই ঢেকে রাখেনি। এই পর্বে নিস্তারিণীর যুক্তি স্থাপনা সামাজিক স্থিতিবাদকেই সমর্থন জানানো, সে অর্থে এই সাবেকী চিন্তায় কোন নূতনত্ব নেই। কিন্তু সংসার-হেঁসেলের জোয়াল ঠেলতে যার হাতে কড়া পড়ে গেছে, তার যুক্তি গ্রাহ্যতা একেবারে মরে যায়নি এটাই দর্শনীয় ব্যাপার।

- পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাইতো।

অথবা,

- সাতপাকে যেদিন ঘোরা হল সেদিন সে যে দেহে মনে বাঁধা পড়ল, তার তো পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।

স্বেচ্ছাবন্ধন পিয়াসী নারীর এ অন্ধতার, অজ্ঞানতার কথা। কিন্তু এ কথাও তো ভাববার, সমাজ যখন নারীর দাঁড়াবার আর কোন জায়গা রাখেনি, তখন স্থিতিধর্মে গরবিনী হওয়া ছাড়া স্তোক-সান্ত্বনার আর জায়গা কোথায়? মুক্তি পিয়াসার দিনে অপচিত নারীত্বের জন্য ভুক্তভোগী নারীর বেদনা তো বুক চিরে এই ভাবেই বেরিয়ে আসে। এও তো পরোক্ষে নারী স্বার্থেরই অন্য ভঙ্গিমার কথা। ঘোষালবাড়ির বৈশিষ্ট্যহীনা মেজো বউ যে একথা বিপ্রদাসের মতো বিদগ্ধ পুরুষের সামনে উচ্চারণ করতে পারলো এটাই তো যথেষ্ট গৌরবের বিষয়। বিপ্রদাস-নিস্তারিণী তর্কের হয়তো আরও একটি ইঙ্গিতার্থ আছে। নারীর সমস্যা, অসম্মান এসব কিছু নারীরই বিশদ অনুধাবনের বিষয়, কোন অকৃতদার পুরুষ তার প্রকৃত হকদার হতে পারে না, মোতির মার স্পষ্ট বাচনিকতা সম্ভবত তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এখানেই নগণ্য মোতির মার ভূমিকার মর্যাদা অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

নবীন :

নবীন পত্নীগত প্রাণ এক ছাপোষা ভীরু মধ্যবিত্ত। দাদা-বৌদির দাম্পত্য দ্বন্দ্বে অনুকূল এবং প্রতিকূল এই দুরকম ভূমিকা পালন না করলে এই বৈশিষ্ট্যহীন চরিত্রটির কোন দামই থাকতো না উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আগ বাড়িয়ে তার কিছু সদ্গুণের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীর এই শংসাপত্রটুকু না থাকলে নবীনকে চিনতে আমাদের সত্যিই অসুবিধে হতো। সুতরাং বিশ্লেষণে প্রবেশের আগে শিল্পীর সেই জবানি অংশটা আগে দেখে নেওয়া দরকার।

- মধুসূদন নবীনকে গভীর ভাবে স্নেহ করে।...পিতার মৃত্যুর পর নবীনকে মধুসূদন কলকাতায় আনিয়ে পড়াশোনা করিয়েছে এবং তাকে বরাবর রেখেছে নিজের কাছে। সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুতা। তার কারণ সে খুব খাঁটি। আর একটা হচ্ছে তার কথাবার্তার ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ বাড়ীতে যখন কোনো ঝগড়াঝাঁটি বাধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। নবীন সব কথায় হাসতে জানে, আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না, এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে তারই পরে ওর বিশেষ পক্ষপাত।

গল্পকারের এই পরিচয় অংশটি সঙ্গে না থাকলে মধুসূদনের উপর্যুপরি তাড়নায় হয়তো তার অপদার্থতাই প্রমাণ হয়ে পড়তো। কিন্তু এমন কিছু সৎ চিত্তবৃত্তির সন্ধান এখানে মিললো যার প্রমাণগ্রাহ্য নমুনা উপন্যাসে বিরল। মধুসূদনের বকুনি-ধমকের পিছনে অতঃপর আমরা অনুজের প্রতি প্রশ্রয়ের দিকটাও সন্ধান করতে পারবো।

নবীনের দাদার প্রতি নির্ভরতার পিছনে কিন্তু এক ধরনের মানসিক আলস্যই আছে। আর একটু সদর্থক ভাবে ভাবলে একে হয়তো শান্তশিষ্ট নির্বিরোধী মানুষের স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা বলে ধরা যেতে পারে। রজবপুরে চাষের কাজে পড়ে থাকা অন্য দুই ভাইয়ের তুলনায় তার কৃতার্থতাবোধ থাকা কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু দাদার বর্ধমান ব্যবসার অংশীদার না হয়েই

শুধু তার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশ্বস্ত caretaker হওয়ার মধ্যে আত্মগৌরবের কিছু নেই। আত্মোন্নতির স্বাভাবিক স্বার্থবুদ্ধিটাও না থাকা তার চরিত্রের সদ বা বদগুণ দুই-ই হতে পারে। তবে নবীনের এ জাতীয় দাস্যবৃত্তি যে তার স্ত্রী নিস্তারিণীর পছন্দ নয় একথা ঠিক। এজন্যই স্বামীর চরিত্রে স্বাবলম্বন শক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য মোতির মার এত চেষ্টা। অন্য দু-ভাইয়ের মতো রজবপুরে চাষের কাজ করলে যে কোথায় ক্ষতি তা নিস্তারিণী বুঝে উঠতে পারে না।

উপন্যাসে নবীনের আবির্ভাব ২৭ সংখ্যক পরিচ্ছেদের একেবারে শেষ অংশে। অন্যান্য চরিত্রের বেলায় একটা পূর্বপ্রস্তাবনা রাখা হয়েছিল। অন্তত তিন প্রধান চরিত্র এবং অপ্রধানের প্রধান নিস্তারিণীর বেলায়। কিন্তু এখানে নবীন আচম্বিতেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তার প্রসঙ্গ প্রস্তাবনা এসেছে আরো অনেক পার ৩৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদে। আত্মপ্রকাশ মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'নবীন ছিল বাড়ির ম্যানেজার'। তাই পারিবারিক সংকট লগ্নে গৃহকর্তার তলব নিয়েই তার প্রবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। নববধূ রাগের মাথায় একতলার বাসনমাজা কলে পিলসুজ পরিষ্কার করছে, ব্যাপারটি ঘোষালবাড়ির মর্যাদার পক্ষে একবারই বিসদৃশ। ব্যাপারটার প্রতীকমূল্য হয়তো থাকতে পারে। কুমু পিলসুজ সাফ করছে, কারণ তার বিবাহিত জীবনের দীপ এখনও জ্বলেনি, আর সারা উপন্যাস জুড়েই জীবন দীপাধারের ঘষামাজার কাজ তাকে করতে হবে। কিন্তু এই দ্যোতনার কোন মূল্যই নেই আদ্যন্ত স্থূল মধুসূদনের কাছে। তাই সংসারের ডিসিপ্লিন রক্ষার জন্য পারিবারিক ম্যানেজারকে হাঁক পেড়ে ডেকে এনে তার দায়িত্ব বিষয়ে তাকে সজাগ করা হয়েছে। উপন্যাস জুড়ে বেশ কয়েক বারই নবীন তলব সূত্রে মধুসূদনের মুখোমুখি হয়েছে। মধুসূদনের চড়া হাঁকডাকের সামনে তার থিতিয়ে থাকার দশা দেখলে মনে হয়, নবীন দাদাকে যমের মতোই ভয় করে। কিন্তু গভীর অর্থে কথাটা ঠিক নয়। নবীন তার দাদার মেজাজ-মর্জি নখদর্পণের মতোই চেনে। কোথায় দাদার সীমাবদ্ধতা তাও বিলক্ষণ বোঝে। সুতরাং দাদার কাছে কম্পিত হওয়াটা তার আসল চেহারা নয়। আসলে, ছাপোষা মধ্যবিত্তের আশচয়চ্যুতি জনিত ভয়ই তাকে মধ্যে-মধ্যে আচ্ছন্ন করে। কারণ মধুসূদন হামেশাই তাকে আশ্রয়চ্যুত করার ভয় দেখায়। কলকাতায় সুখের নজরদারির কাজ ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনিশ্চিত শ্রমে যুক্ত হতে তার মন চায় না। তার দ্বিতীয় ভয় তার স্ত্রীকে নিয়ে। সে নিস্তারিণীর ভক্ত, আর দাদা নিস্তারিণীর ব্যক্তিত্বকে সহ্য করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-দ্বন্দ্বে নিস্তারিণী দায়প্রসঙ্গ বারবার যুক্ত হয়। নবীন ভয় করে প্রকাশ্যে তার স্ত্রীর হেনস্থায়।

নবীনের দাম্পত্য জীবনে অবস্থান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া তথ্য এই রকম।—

- মেজো বউয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন কি নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য বলেই মনে করে। সেজন্যেই তার ভাগ্যে কোনো একটা দুরূহ করবার উপলক্ষ জুটলে যতই ভয় করুক সেই সঙ্গে খুশিও হয়।

ভায়ে-ভায়ে স্বভাবে আশ্চর্য মিল। বড়ো ভাই কুমুর সৌন্দর্যকে 'একটা দৈব আবির্ভাব' ভেবেই মুগ্ধ, হয়তো ভক্তিও করে, ছোটজন তো সরাসরিই ভক্তি কবলিত। আর দু-জনেই নিজেদেরকে স্ত্রীর অযোগ্য বলে জ্ঞান করে। শুধু তফাত এই, ভক্তি আর দাসত্বে মেলবন্ধন ঘটাতে না পারার জন্য মধুসূদন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আর নবীন হাস্যমুখে দুর্গমের রাজ্য থেকে কিশোরের মতই রক্তকরবী ফুল সংগ্রহ করার জন্য অস্থির হয়। নবীনের এই হাবভাবের লৌকিক নামই তো হলো স্ত্রৈণতা! বিপ্রদাসের চিঠি এসেছে কিনা দেখার জন্য দাদার ডেস্ক

ছাতড়ানো, দাদার স্বাস্থ্য-অবনতি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন কুমুর চিত্ত শান্ত করার জন্য দাদার বিনা হুকুমে সংসার খরচের টাকায় টেলিগ্রাম করা, এই দুটোই নিস্তারিণী নির্দেশিত দুরূহ কাজ। স্ত্রীর পরামর্শ মাফিক কাজে নেমে আত্ম সন্তুষ্ট নবীন হাতে-কলমে এ শিক্ষাও পেয়েছে, দাদা যতো গর্জায়, ততটা বর্ষায় না। এ কাজের জন্য কোন পরিণামী শাস্তি তাকে এবং তার পরিবারকে ভোগ করতে হলো না, এটাও তার এক বড়ো স্বস্তি। স্ত্রীর দূরদর্শিতার প্রমাণ পেয়ে নবীনের ভক্তিযোগ আরো পাকা হলো বলেই আমাদের ধারণা।

শুধু স্ত্রী-ভক্তিই নয় নবীনের মধ্যে বৌদি-ভক্তির লক্ষণও রবীন্দ্রনাথ সংরক্ষিত রেখেছেন। কুমুর যে দিবাতায় মধুসূদন বিশ্বাসী, নবীনও সেই ধারণার অন্তর্গত। স্ত্রীর ইচ্ছামত যে দুটি দুরূহ কাজ সে ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করেছে, তার পিছনে স্ত্রীর অনুজ্ঞা ছাড়া আরও কিছু ছিল। কাজ দুটি ছিল কুমুর স্বার্থরক্ষার জন্য, এটাই হয়তো তার কার্যসাধনের সাহসকে বাড়িয়ে দিয়ে থাকবে। ভক্তি দৃষ্টান্তে নবীন কুমুর কাছে একেবারে দেবর লক্ষ্মণ। এই ভক্তি পরবশতার পরিচয় প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটি পরিচ্ছেদ ব্যয় করেছেন। ৪৯নং পরিচ্ছেদে বিপ্রদাসের বাড়ীতে গিয়ে নবীন বৌ-রাণীর কাছে তার একটি গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

- আমাদের বাড়িতে থাকতেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জো পাইনি। ভক্তকে একখানা ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেওয়ালে ঐ তো সামনেই ঝুলছে।

৫২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে এই ভক্তিবৃত্তির ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত রসালাপে তৃতীয়পক্ষ কুমুকে নিয়ে কিছু কথার উতোর-চাপান হচ্ছিল। স্ত্রীর target স্বামীর অতিমাত্রার কুমু-ভক্তি আর নবীন সেখানে defence তরফের লড়িয়ে। হাল্কা মেঘের মতো কিছু লঘু কটাক্ষে আলাপ মুহূর্তটি বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। নবীনের সংগ্রহকরা বৌ-রাণীর ফটোগ্রাফ নিয়ে দাদার টানাটানির কৌতুকময় বিবৃতি কখন যেন ভাবাবেগে serious হয়ে উঠেছে। বৌরাণীর ছবি খোয়ানো নবীনের কাছে স্বর্গ খোয়ানোরই সামিল, নিস্তারিণীর এই চটুল মন্তব্যে নবীনের জবাব—

- এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঐ ছবিটা দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি করে দেখা যায়।'

বৌরাণীর ছবি নিয়ে দেওরের এই বাড়াবাড়ি আচরণে নিস্তারিণীর ক্ষুণ্ণতা মাপারও চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নবীন জিজ্ঞাসা করেছে :

- মেজো বউ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।
  না, কখখনো না।
  হাঁ, অল্প একটু।

নবীন যে অন্ধ নয়, তারও বিচার শক্তি আছে তারই নিদর্শন এই দৃশ্য। অবশেষে অনুমানের পালা শেষ হয়েছে এক মধুর ফয়সালায়। বুদ্ধিমান নবীন স্টেশনে বিপ্রদাসকে দেখে নিস্তারিণীর ভক্তিময় আবেগের পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়েছে প্রসঙ্গটির।

নবীন timid হতে পারে, কিন্তু তার বিচার বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। চোখের সামনে একটি দাম্পত্য নষ্ট হতে যাচ্ছে, এর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছে নবীন বেশ চৌকস ভাবে, নিরপেক্ষতার সঙ্গেই। যে বৌরাণীকে সে এতো ভক্তি করে, তাঁর দায়টাও তার চোখ এড়ায় নি। নিস্তারিণীর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য—